প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

মে
১৯৫৮

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

উপহার

লেখক-পরিচিতি

বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল মহামনীষী ভিক্টর মারি হ্যুগোর জন্ম হয় ফরাসীদেশে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। কৈশোর থেকেই সাহিত্য সাধনার দিকে ছিল তাঁর প্রবল আসক্তি।

হ্যুগোর বৈশিষ্ট্যই হল অতি সাধারণ মানবের ভেতরে অতিমানবতার উন্মেষ সাধন। সামান্য সূচনা থেকে যেভাবে এর বিকাশ তিনি ফুটিয়ে তোলেন সংঘাত ও বিবর্তনের মাধ্যমে, তা শুধু মহত্তর স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। দীনতম পরিবেশের ভেতর নরদেবতার আবির্ভাব যে সচরাচর ঘটে থাকে, তাই যেন হ্যুগো-সাহিত্যের চরম প্রতিপাদ্য।

লা মিজার‍্যাব্‌ল্‌, হাঞ্চব্যাক্‌ অব্‌ নোৎরদাম্‌, টয়লার্স অব দি সী প্রভৃতি গ্রন্থ মানবজাতির চিরন্তন সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি রচনাই রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। মানুষের ভেতর যতদিন অমৃতের পিপাসা বর্তমান থাকবে, ততদিন সমাদর থাকবে এদের।

হাঞ্চব্যাক্‌ অব্‌ নোৎরদাম্‌ উপন্যাস হ্যুগোর অন্যান্য রচনার মতই ঐতিহাসিক পটভূমিকার ওপরে সামাজিক কাহিনী। এ কাহিনীর একপ্রান্তে এস্‌মেরেলদা, অন্য প্রান্তে কোয়াসিমোদো—বিউটি ও বীস্ট—পরী ও পশু।

হ্যুগো শুধু উপন্যাস রচনাই করেন নি, নাটকেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অবশ্য বলিষ্ঠ আদর্শবাদের আলোক বিচ্ছুরণ করে তাঁর উপন্যাসগুলিই অর্জন করেছে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যু হয়।

"রক্ষা করো, বাঁচাও। আমায় খুন করল।"

॥ ১ ॥

রীমস শহরে এক সময়ে এক অভাগিনী রমণীর বাস ছিল। তার নাম প্যাকেট, পোশাকী নাম শাঁতে ফ্লু'্যরি।

একটি শিশুকন্যা ছাড়া সংসারে তার আপনজন আর কেউ ছিল না। মেয়েটি ছিল তার চোখের মণি। তাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালবাসত। এক দণ্ড না দেখলে একেবারে পাগল হয়ে যেত। তাকে কোলে নিয়ে, বুকে চেপে, চুমো খেয়ে কত রকমে যে আদর করত! তবু আশ মিটত না। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী ছিল। দেব শিশুও তার রূপের কাছে হার মানত।

মাখনের মত কোমল, গোলাপের মত পেলব, যেন একটি জীবন্ত পুতুল! তার চুলগুলি ছিল ভ্রমরের মত কালো, চোখ দুটি ছিল হরিণীর মত চকিত, উজ্জ্বল। ছোট ছোট পা দুখানি ছিল রক্তাভ।

সব কাজ ফেলে প্যাকেট তার মেয়ের সাজ নিয়েই সারা দিন ব্যস্ত থাকত। আর সে সাজেরই বা কি বাহার! নিজের একটি মাত্র পোশাক, তাও শতছিন্ন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ মেয়ের জন্য চাই জরির পোশাক, সাটিনের টুপি, সিল্কের ফিতা, চুমকি বসানো ভেলভেটের জুতা!

এ সব জিনিস সে কোন দিন দোকান থেকে কিনত না, বসে বসে নিজের হাতে তৈরি করত। জুতা জোড়াটিও তারই করা। সেটি পায়ে দিলে তার মেয়ের পায়ের শোভা যেন আরও বেড়ে যেত।

প্যাকেট আদর করে মেয়ের নাম রাখল অ্যাগনেস। অভাব অনটন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও অ্যাগনেস ছিল আনন্দের উৎস। তার

মুখের দিকে চাইলে, তাকে কোলে নিলে কোন অভাবের কথাই আর মনে পড়ত না, কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হত না।

কিন্তু তার কপালে এত সুখ সইল না।

একদিন রীমস শহরে এক বেদের দলের ছাউনি পড়ল। তাদের গায়ের রং পিঙ্গল, চুল কোঁকড়ান, কানে রূপার মাকড়ি। দেখতে কদাকার, স্বভাবও নোংরা। মেয়েরা আরও কুৎসিত, আরও ময়লা। তাদের মুখে কোন আবরণ নেই, পরিধানে শতছিন্ন নোংরা পোশাক, দড়ি দিয়ে কাঁধের উপর টেনে বাঁধা। তৈল শূন্য মাথার চুল অবিন্যস্ত। সঙ্গের ছেলেমেয়েরাও তেমনি, যেন বানরের বাচ্চা!

এরা সমাজহীন যাযাবর। কোন স্থায়ী বাসস্থান নেই। দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানই এদের স্বভাব। সম্প্রতি নানা রাজ্য ঘুরে মিশর থেকে এরা এ দেশে এসেছে। এদের যারা দলপতি, চালচুলো না থাকলেও তাদের সব গালভরা নাম।—ডিউক, কাউণ্ট, সম্রাট্।

এদের কাজ হল লোকের হাত দেখা, ভাগ্যগণনা করা। এরা বাক্-চাতুরীতে এমন সুনিপুণ যে যাকে যা বলে সেই তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করবেই না কেন? সবাইকে এরা আশার কথা শোনায়, রঙীন স্বপ্ন দেখায়। কাউকে বলে রাজা হবে। কাউকে বলে রোমের পোপ হবে। কাউকে বলে সেনাপতি হবে। ফলে নিজেদের ভাগ্যগণনার জন্য এদের কাছে লোকের ভিড় লেগেই থাকত।

এদের আবার দুর্নামও ছিল। সুবিধা পেলেই এরা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চুরি করত, লোকের পকেট কাটত, কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত।

তাই বুদ্ধিমান লোকেরা আর সবাইকে সাবধান করে দিত, যাতে এদের ত্রিসীমানায় না যায়। অথচ তারা গোপনে গোপনে এদের আড্ডায় গিয়ে নিজেদের হাতটি দেখিয়ে আসত।

অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ জানবার সকলেরই আগ্রহ। মেয়েদের তো আরও বেশী। তাই প্যাকেটও একদিন মেয়েকে নিয়ে চুপিচুপি বেদেদের ছাউনিতে হাজির হল।

অ্যাগনেসকে দেখে বেদেনীরা মহা খুশী। তাকে কোলে নেবার জন্য, তার হাত দেখবার জন্য সবার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই চায় তাকে আদর করতে, চুমো খেতে। এদের আদরের আতিশয্যে বেচারী অ্যাগনেস শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলল।

বেদেনীরা সবাই বলল, তার হাত অতি চমৎকার। তার ভাগ্যও খুবই ভাল। বড় হয়ে সে রাজরানী হবে।

প্যাকেট একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করল। তার এমন রূপের ডালি মেয়ে! সে রাজরানী হবে, এ আর বেশী কি!

প্যাকেট তখনই স্বপ্ন দেখতে শুরু করল, অ্যাগনেসের রূপের খ্যাতি সমগ্র ফরাসী দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, কত বড় বড় লোক তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

মেয়ের এই সৌভাগ্যের সংবাদ প্রতিবেশিনীদের দেবার জন্য সে অধৈর্য হয়ে উঠল। তাই পরদিনই অ্যাগনেসকে খাইয়েদাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সে পাড়ায় বেরুল। বের হবার সময় দোরটি ভাল করে বন্ধ করেও গেল না, পাছে কোন রকম শব্দ হয়, আর সে শব্দে মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়!

ফিরতেও বেশী দেরি হল না। সুসংবাদটি সকলকে জানিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। কারণ মনে সর্বক্ষণ চিন্তা ছিল, পাছে মেয়ে জেগে উঠে, মাকে পাশে না দেখে কাঁদতে শুরু করে!

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়ে বুঝল, তার এ চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক। অ্যাগনেসের কোন কান্না শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তবে সে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে!

ঘরে ঢুকতে গিয়েই সে চমকে উঠল। দরজাটি একটু বেশী খোলা, শয্যাও শূন্য। অ্যাগনেস সেখানে নেই—শুধু তার এক পাটি জুতা বিছানায় পড়ে আছে।

প্যাকেটের বুক ভেঙে গেল। একবার চুল ছিঁড়তে লাগল, একবার বুক চাপড়াতে লাগল। তার তখন পাগলের মত চেহারা।

অ্যাগনেসকে খুঁজবার জন্য সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

"অ্যাগনেস! আমার অ্যাগনেস! তুই কোথায়? কে তোকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিল? কোন্ চোর আমার এমন সর্বনাশ করল?" এই বলে বিলাপ করতে লাগল।

পথে যাকে দেখে, তাকেই জিজ্ঞেস করে, তার মেয়েকে সে দেখেছে কিনা। কাউকে হয়ত মিনতি করে বলে, "ওগো আমার মেয়েকে খুঁজে বার করে দাও। আমি চিরদিন তোমার কেনা হয়ে থাকব।"

লোকের বাড়ি বাড়ি উঁকি দিয়ে দেখে, তার অ্যাগনেস সেখানে আছে কিনা।

এভাবে সে সারাটি দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোথাও তার মেয়ের সন্ধান মিলল না, কেউ কোন খবর দিতে পারল না।

এদিকে রাতও হল। তাই সে হতাশ মনে আবার বাড়ি ফিরে চলল। ফেরবার পথে তুএকজন প্রতিবেশিনী তাকে বলল, তারা নাকি দেখেছে, সন্ধ্যার মুখে তুজন বেদেনী একটি পুঁটুলি হাতে তার বাড়ির দিকে গেছে। একটু পরই আবার খালি হাতে ফিরে গিয়েছে। তার পরই তারা শিশুর কান্নাও শুনতে পেয়েছে।

এই সংবাদ শুনে তার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তবে সে আবার তার অ্যাগনেসকে দেখতে পাবে, আবার তাকে কোলে নিতে পারবে।

সে ছুটতে ছুটতে এসে গৃহে প্রবেশ করল। কিন্তু কোথায় তার অ্যাগনেস? তার পরিবর্তে রাক্ষসের মত কুৎসিত কদাকার এক বিকট শিশু কেঁদে কেঁদে মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তার একটি চোখ অন্ধ, পা তুটি বাঁকা, পিঠে কুঁজ। দেখলেই মন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে ওঠে। তার বয়স বছর চারেক হবে। কিন্তু এখনও ভাল করে কথা ফোটেনি। তাই তার কান্না মানুষের না পশুর, তা বোঝবার জো ছিল না।

তার দিকে একবার চোখ বুলিয়েই প্যাকেট হায় হায় করে উঠল। ডাইনীরাই তবে তার সোনার জাতুকে এমন রাক্ষস করে দিয়েছে!

এ দৃশ্য তার সহ্য হচ্ছিল না। বিছানার উপর অ্যাগনেসের যে এক পাটি জুতো পড়েছিল, তাই সে বুকে চেপে ধরল। তার চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই, শরীরে স্পন্দন নেই। মনে হয় সেও বুঝি মরে গেল!

কিছুক্ষণ পর তার চেতনা ফিরে এল। তার দুচোখ থেকে দর-বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমার সোনা, আমার জাদু, আমার অ্যাগনেস! তুই কোথায়? আয়, আমার বুকে ফিরে আয়।"

সে দৃশ্য দেখলে পাষাণ বিগলিত হয়, সে বিলাপ শুনলে শুষ্ক চক্ষুও সজল হয়ে ওঠে।

হঠাৎ প্যাকেট উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, "ওগো প্রতিবেশীর দল, তোমরা দয়া করে আমার সাথে বেদেদের ছাউনিতে চল।" রাস্তার প্রহরীদের বলল, "তোমরাও আমার সাথে চল। ডাইনীদের ধরে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করতে হবে।"

অন্ধকারেই সে আবার পথে বেরুল। জন কয়েক প্রতিবেশী ও দুই একজন প্রহরীও তার সঙ্গে গেল। বেদেদের আড্ডায় পৌঁছে দেখা গেল, তারা ছাউনি তুলে কোথায় চলে গেছে। সেই অন্ধকারে তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

পরদিন খবর এল, শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে এক জায়গায় কিছু ছাই, অ্যাগনেসের চুলের ফিতা, কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ ও ছাগলের নাদি পাওয়া গেছে। কারও মনে আর সন্দেহ রইল না; বেদের দল অ্যাগনেসকে মেরে ফেলেছে। আগুনে সেঁকে তার মাংস খেয়েছে।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনে প্যাকেট একেবারে পাষাণ হয়ে গেল। তার মুখে কোন কথা নেই, চোখে এক ফোঁটা জল নেই। পরদিন দেখা গেল, এক রাতেই তার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে।

তার পরদিন থেকে তাকে কেউ আর দেখতে পেল না। সে যে কোথায় গেল, তাও কেউ জানল না।

॥ ২ ॥

দিন কয়েক পরে।

ইস্টার উৎসবের পর সেদিন প্রথম রবিবার। ফরাসী দেশে এই রবিবারটিকে বলা হয় কোয়াসিমোদো।

প্রভাতী উপাসনা সেরে সবাই নোৎরদাম গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখে দরজার পাশে রোয়াকের উপর খাটিয়ায় একটি শিশু শুয়ে। তার বয়স বছর চারেক। খাটিয়ার সামনে একটা তামার থালা।

তখনকার দিনে যে সব বাপ মা তাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পরাতে পারত না, বা যাদের মা বাপ থাকত না, তাদের এ খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হত। শহরের কারও ইচ্ছে হলে এদের চিরদিনের জন্য নিয়ে নিতে পারত। তখন তাদের উপর তাদের বাপ মার আর কোন দাবি থাকত না। আবার কারও যদি শিশুটিকে কোন সাহায্য করবার ইচ্ছা হত, তবে সে তামার থালাটায় তা রেখে যেত।

শিশুটিকে দেখবার জন্য অনেকেই ভিড় করে দাঁড়াল। তাদের বেশির ভাগই স্ত্রীলোক। শিশুটিকে দেখে তারা এক একজন এক এক রকম মত প্রকাশ করতে লাগল।

"এটা কি মানুষ, না বেবুনের বাচ্চা?"

"কি চেহারা! বাঁ চোখের ওপর কি প্রকাণ্ড আব।"

"আব কোথায়? ওটা একটা ডিম। ফুটে ও থেকে এরই মত আর একটা রাক্ষস বেরুবে।"

"হতভাগা আজীবন এখানেই পড়ে থাকবে। কে আর একে নেবে?"

"একে দেখে মনে হচ্ছে, দেশে মহা দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। গত বারের মড়কের জেরই এখনও কাটেনি; ব্যবসা-বাণিজ্যেও মন্দা চলছে; আবার শুনছি, ইংরেজরাও নাকি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। এই সব অমঙ্গলের মূলেই হচ্ছে এই হতভাগা।"

"এই শয়তানটাকে পুড়িয়ে মারলেই সব আপদ চুকে যায়।"

"ঠিক বলেছ।"

যাকে উপলক্ষ্য করে এই আলোচনা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, সত্যই সে মানুষরূপী মাংসপিণ্ড। প্যারীর মহামান্য বিশপের নামাঙ্কিত একটা থলির মধ্যে বাঁধা। থলির এক মুখ খোলা। তাতে শিশুটির শুধু মাথার খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

তার মুখের গঠন বিকৃত। চুলগুলি লাল। একটি চক্ষু অন্ধ। দাঁতগুলি মুলোর মত, একটি আবার হাতির দাঁতের মত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চেহারা কদাকার।

শিশুটি থেকে থেকে কাঁদছিল, আর থলি থেকে বেরুবার জন্য হাত পা ছুড়ছে।

ভিড়ের এক পাশে দাঁড়িয়ে এক তরুণ ধর্মযাজক নীরবে জনতার এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনছিলেন। তাঁর মুখশ্রী গম্ভীর, ললাট প্রশস্ত, নয়ন যুগল বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি ধীরে ধীরে শিশুটির দিকে এগিয়ে গেলেন, খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখলেন, তারপর তাকে কোলে তুলে নিলেন।

সবাই ভাবল, পুড়িয়ে মারবার জন্যই বুঝি তিনি তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সবাইকে অবাক্ করে দিয়ে তিনি বললেন, "আমিই একে নিলাম।"

এই বলে তিনি তাঁর আলখাল্লায় তাকে জড়িয়ে গির্জার ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি নোৎরদাম গির্জারই একজন ধর্মযাজক। নাম ক্ল্যঁদ ফ্রোলো।

তাঁর এই কাণ্ড দেখে সবাই বিস্মিত হল। একজন বলেই ফেলল, "আমি আগেই জানতাম। ক্ল্যঁদ ফ্রোলো শুধু পাদ্রী নন, তিনি একজন জাদুকরও। তাঁর জাদুর কাজের জন্যই তিনি এই রাক্ষসটাকে নিয়ে গেলেন।"

এ শুধু আক্রোশের কথা। বাস্তবিক ক্ল্যঁদ ফ্রোলো অভিজাত বংশের সন্তান। বয়স একুশ বছর। এই বয়সেই মধুর স্বভাব ও পাণ্ডিত্যের গুণে তিনি নোৎরদাম গির্জার ধর্মযাজকের পদ লাভ করেছেন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি। চপলতা তিনি পছন্দ

করতেন না। নিষ্ঠা সহকারে পড়াশুনা করতেন। স্মৃতিশক্তিও ছিল প্রখর। তাই যাই পড়তেন, তাই বেশ মনে থাকত।

ধর্মশাস্ত্র পাঠ শেষ হলে তিনি আইন, চিকিৎসা 'শাস্ত্র এবং নানা ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

এই সময়ই তিনি তাঁর পিতামাতা দুইই হারান। ফলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেঁহার সব ভার তাঁর উপর পড়ল। জেঁহা তখন মাত্র কয়েক মাসের শিশু।

এতদিন তিনি শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যেই বিচরণ করছিলেন। এবার তাঁকে সংসারের মুখোমুখি হতে হল। এতদিন ছিল শুধু মস্তিষ্কের চর্চা, এবার হৃদয়চর্চার দিকেও মন দিতে হল। শুষ্ক হৃদয়ে স্নেহের বন্যা নামল। ছোট ভাইটিকে তিনি মায়ের স্নেহ ও বাপের দায়িত্ব নিয়ে মানুষ করার ব্রত নিলেন।

তাঁর এই স্নেহপ্রবণ মন নিয়েই তিনি সেদিন কদাকার শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। গির্জায় গিয়ে তিনি থলি থেকে তাকে বের করলেন। দেখলেন, তার বাঁ চোখের উপর প্রকাণ্ড এক মাংসপিণ্ড। তার ফলে সে চোখটি অন্ধ। মাথাটি দুই কাঁধের মাঝামাঝি বসা, মেরুদণ্ডটি বাঁকা, একটি পা আর একটির চাইতে ছোট। সব মিলিয়ে কুশ্রী, কদাকার, বিকৃত চেহারা।

ছোট ভাইটির অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তিনি স্থির করলেন, এই শিশুটিকেও তিনি যে করেই হোক মানুষ করবেন।

কোয়াসিমোদো-রবিবারে পেয়েছিলেন বলেই হোক, কিংবা তার এই অসম্পূর্ণতার জন্যই হোক তিনি তার নাম রাখলেন, কোয়াসিমোদো।

॥ ৩ ॥

এর ষোল বছর পরের কথা।

ক্ল্যঁদ ফ্রোলো নোৎরদাম গির্জার আর্চডিকন পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কোয়াসিমোদোও আর সেই শিশুটি নেই। ক্ল্যঁদ ফ্রোলোর স্নেহের ছায়ায় থেকে সে এখন যৌবনে পা দিয়েছে।

কিন্তু বয়স বাড়বার সাথে সাথে তার দেহের কদর্যতাও বেড়েছে। তার পা আর মেরুদণ্ড আরও বাঁকা হয়েছে, পিঠের কুঁজটি আয়তনে আরও বড় হয়েছে। দাঁড়াতে গেলে এখন তাকে কুঁজো হয়ে দাঁড়াতে হয়, হাঁটতে গেলে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। বাঁ চোখের উপরকার আবটি বেড়ে যাওয়ায় এবং তার গজদন্তটি আরও লম্বা হওয়ায় চেহারাটা আরও কুৎসিত দেখায়। তাকে দেখলেই ঘৃণার সঞ্চার হয়।

তবে তার শরীরের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ না বলে তাকে একটি অসুর বলা চলে।—এমনি তার উন্নত বক্ষ, সুদৃঢ় দেহ, অমানুষিক শক্তি।

ক্ল্যঁদ ফ্রোলো অসীম ধৈর্যে অনেক চেষ্টা করে তাকে প্রথমে কথা বলতে এবং পরে কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। তিনিই প্রথম তাকে গির্জার ঘণ্টা বাজাবার কাজ দেন। তাঁর অনুগ্রহেই সে এখন গির্জার প্রধান ঘণ্টাবাদক।

নোৎরদাম গির্জাটি সুউন্নত, বিরাট, মহান্। যেন পাষাণের ছন্দে গাঁথা সংগীতের সুর—এমনিই তার সৌন্দর্য। এই পুরাতন গির্জাটি যুগ-যুগের ভাস্কর্যের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত জাতির শিল্পের স্বাক্ষর তার পাষাণ দেহে।

এ যেন কোন বিশেষ যুগের বিশেষ শিল্পীর সৃষ্টি নয়। যেন বহু যুগের বহু শিল্পীর, বহু সাধকের বহু চিন্তার সম্মিলিত রূপ। এর ভেতরের নানা আকৃতির পাষাণমূর্তি, প্রাচীরের গায়ের নানা সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্য, এর বাতায়নে অপরূপ তরুলতা পত্র পুষ্পের কারুকার্য, সব দিক দিয়েই এ অতুলনীয়, অভিনব, চিরন্তন।

মাতাপিতার স্নেহছায়া বঞ্চিত, সংসার ও সমাজ থেকে নির্বাসিত বিকলাঙ্গ বিকৃতদর্শন কোয়াসিমোদো এই গির্জার পরিবেশেই মানুষ। এই গির্জাই তার সমাজ, সংসার, দেশ, তার জগৎ। গির্জার সাথেই তার আত্মিক সম্পর্ক।

গির্জার ভিতর বা বাইরে এমন কোন স্থান ছিল না, যা তার অপরিচিত। এমন কোন টাওয়ার ছিল না যা সে আরোহণ করেনি। কতবার সে খালি হাত পায়ে দেওয়াল বেয়ে গির্জার চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে টিকটিকির মত তার অনায়াস-নৈপুণ্য ছিল। এত উঁচুতে উঠতে তার কোন দিন বুক কাঁপেনি, ভয় হয়নি, হাত পা অবশ হয়নি। এক অলিন্দ থেকে আর এক অলিন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া তার কাছে খেলা ছাড়া আর কিছু মনে হত না। এ বিষয়ে তার বানরের মত দক্ষতা ও কৃষ্ণসার হরিণের মত ক্ষিপ্রতা ছিল।

নোৎরদাম গির্জাই ছিল কোয়াসিমোদোর সব। সে যেন গির্জারই একটা অংশ। সব সময়েই তাকে গির্জার উপরে নীচে ভিতরে বাইরে, কোনও না কোন জায়গায় দেখা যেত।

গির্জার নীচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চাইলে যে খর্বকায় প্রাণীটিকে চূড়ায় দাঁড়ানো, বা বুকের উপর ভর দিয়ে চূড়া থেকে অলিন্দের দিকে নামতে দেখা যেত, সে কোয়াসিমোদো। গির্জার বাইরের দেওয়ালে যে দৈত্য-মূর্তি হাঁ করে আছে, তার ভেতরে কাকের বাসা থেকে তার ছানা ধরে আনতে যে জীবন্ত দৈত্যটিকে দেখা যেত, সেও কোয়াসিমোদো। গির্জার সবচেয়ে উঁচু টাওয়ারে যার প্রকাণ্ড মস্তক ও বিকৃত দেহ ঘণ্টা বাজাবার দড়িতে দোল খাচ্ছে দেখা যেত, সেও কোয়াসিমোদো। সে তখন সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি করছে। এমন কি গভীর নিশীথে অন্ধকার গির্জার টাওয়ারে টাওয়ারে যে বীভৎস মূর্তি দেখে আশেপাশের ছেলেমেয়েরা ভয়ে আঁতকে উঠত, সেও কোয়াসিমোদো।

প্রকৃতি তাকে জন্ম থেকেই পরিহাস করেছিল। একটি চোখ, খোঁড়া পা, কুঁজো পিঠ নিয়েই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সম্বলের মধ্যে

ছিল তুটি কান। কিন্তু যে ঘণ্টাগুলি তার এত প্রিয় ছিল, যাদের বাজাতে তার কোনদিন ক্লান্তি হত না, তাদেরই বিকট শব্দে সে তার শ্রবণশক্তিটুকুও হারাল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের যে একটি ক্ষীণ সূত্র ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে গেল।

বহিঃপ্রকৃতির যে শব্দ তার কর্ণে প্রবেশ করে তার মনের আকাশে আনন্দের ক্ষীণ রশ্মি জ্বালিয়ে তুলত, চিরদিনের জন্য অন্ধকারে তা হারিয়ে গেল।

বধির বলে কেউ তাকে উপহাস করে, এই ভয়ে সে কথা বলাই বন্ধ করে দিল। দীর্ঘ দিনের এই নিঃশব্দতার ফল এই হল, প্রয়োজনের সময় কথা বলতে গেলে তার আড়ষ্ট জিহ্বার উচ্চারণ অস্পষ্ট হত।

শ্রীহীন দেহের মত তার মনও ছিল অপরিণত। সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি না থাকায় সংসারের অনেক জিনিসেরই সে মর্ম গ্রহণ করতে পারত না। তাই সকলের উপর ছিল তার বিদ্বেষের ভাব। অন্যের অনিষ্ট চিন্তায় সে আনন্দ পেত। এর মূলে ছিল তার বন্য স্বভাব, তারও মূলে ছিল তার কুৎসিত চেহারা। তা ছাড়া তার তুর্জয় সাহস ও অমানুষিক শক্তির জন্যও সে মাঝে মাঝে হিংস্র হয়ে উঠত।

জন্মাবধি সে কোনদিন কারও কাছ থেকে এতটুকু স্নেহের স্পর্শ পায়নি। তার ভাগ্যে জুটেছে শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, উপেক্ষা, অবহেলা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তাই সংসারের কারও উপর তারও কোন আকর্ষণ ছিল না।

গির্জার গ্যালারিতে যে সব পাষাণমূর্তি ছিল, তারাই ছিল তার স্বজন। মূক মূর্তিগুলি তাকে কোনদিন উপহাস করেনি। সাধুসন্তদের মূর্তির দিকে চাইলে তার মনে হত, তারা যেন তাদের শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিধারায় তাকে অভিষিক্ত করে দিচ্ছে। দৈত্য দানবের মূর্তিগুলিকেও তার বন্ধু বলে মনে হত। সে তাদের গায়ে হাত বুলাত, তাদের সাথে আপন মনে কথা বলত।

গির্জার ঘণ্টাগুলি ছিল তার সব চাইতে প্রিয়। এদের সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। এদের সে আদর করত, চুমো খেত। এদের নিঃশব্দতার মধ্যে, এদের শব্দতরঙ্গের মধ্যে সে যেন এদের কথা শুনতে পেত। তার বধির কানে শুধু এদের শব্দই একটু আধটু প্রবেশ করত।

পনেরটি ঘণ্টার মধ্যে বড় ঘণ্টাটিই ছিল তার সব চাইতে প্রিয়। তার নাম ছিল মেরী। এটি সে নিজে বাজাত। উৎসবের দিনে সব কয়টি ঘণ্টা যখন এক সাথে বেজে উঠত, তাদের গম্ভীর শব্দ দূর-দূরান্তে ভেসে যেত, তখন কোয়াসিমোদো আনন্দে অধীর হয়ে উঠত। উৎসাহের আতিশয্যে সে তরতর করে উপরে উঠে যেত, অন্যান্য ঘণ্টাবাদকদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিত, খানিকক্ষণ মেরীর দিকে সস্নেহে চেয়ে থাকত, তারপর সে নিজেও বাজাতে শুরু করত।

বাজাবার পরিশ্রমে তার শরীরে ক্লান্তি আসত, কিন্তু তার উৎসাহ একটুও কমত না। সেই শব্দতরঙ্গের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সে ভাবত, এই গির্জা, গির্জার ঘণ্টা, আর সে একই বিরাট সত্তার পৃথক পৃথক অংশ মাত্র।

এই গির্জা ও তার পরিবেশ ছাড়া আর যে একজন ব্যক্তি তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনি এই গির্জারই আর্চডিকন্ ক্লঁদ ফ্রোলো। কোয়াসিমোদো তাঁকে পিতার মত, গুরুর মত মান্য করত। তাঁর কথায় সে তার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারত।

নোৎরদাম গির্জা আর তার আর্চডিকন্—এই ছিল কোয়াসি-মোদোর জগৎ সংসার।

॥ ৪ ॥

সেদিন জানুয়ারীর কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত।

প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও প্যারী নগরী উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ি দোকানপাট বন্ধ করে স্ত্রী-পুরুষ বালক বৃদ্ধ দলে দলে পথে বেরিয়েছে। কে কার আগে প্যাঁলে দ্য জাস্টিসে পৌঁছবে ভাল জায়গাটি দখল করবে, সবার মনে সেই এক চিন্তা।

প্যাঁলে দ্য জাস্টিস্ এক সময়ে রোম সম্রাট্‌দের প্রাসাদ ছিল। তার বিশাল আয়তন, প্রশস্ত চত্বর। আজ সেখানে তুটি উৎসব হবে। তা ছাড়া ফ্ল্যাণ্ডার্সের রাজদূত বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে তুটি উৎসবেই উপস্থিত থাকবেন।

উৎসব শুরু হবে বেলা বারোটায়। কিন্তু এর মধ্যেই এত লোক এসেছে যে ওখানে আর স্ূঁচ ফেলবারও জায়গা নেই। জনতা অপেক্ষা করতে লাগল। তবে নীরবে নয়। এখানে ওখানে গুঞ্জন কোলাহল কলরব শুরু হল। যার যা অভিরুচি, তাই নিয়ে সে পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

তারপর এক সময় বারোটা বাজল। প্রথমে নাট্যানুষ্ঠান হবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। জনতা অধৈর্য হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল।

"রাজদূতের জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না। এখনই অভিনয় শুরু করো।"

"নইলে আমরা সব ভেঙে তচনচ করে দেব।"

বেগতিক দেখে সাজ ঘর থেকে একজন অভিনেতা মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনারা দয়া করে একটু শান্ত হোন।"

জনতার কোলাহল অনেকটা থেমে গেল। কিন্তু অভিনেতা যেই আবার বলতে শুরু করল, "আমরা তৈরী। শুধু আমাদের সম্মানিত রাজদূতের"—

তার কথা আর শেষ হল না। জনতা আবার মারমুখো হয়ে উঠল।

—"চুলোয় যাক রাজদূত। আমরা আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। এখনই, এই দণ্ডে অভিনয় শুরু করতে হবে।"

এবার থামের আড়াল থেকে এক ক্ষীণকায় ব্যক্তি মঞ্চে প্রবেশ করল। দীর্ঘ রক্তহীন বিবর্ণ চেহারা। অথচ বয়স বেশী নয়। এরই মধ্যে ললাটে বলিরেখা দেখা দিয়েছে, গাল দুটি বসে গেছে। মলিন জীর্ণ পরিচ্ছদে ক্ষীণ দেহ আবৃত। দেখলেই মনে হয় অভাবের তাড়নায়, দারিদ্র্যের পেষণে একেবারে নিষ্পেষিত।

নাম গ্রীঁগোয়ার। কবি ও দার্শনিক। আজ যে নাটকটির অভিনয় হবে, সেটি তারই লেখা। তার নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য সবাই এমন ব্যাকুল, এই দেখে তার মন আনন্দ ও গর্বে ভরে গেল। বলল, "আমরা এক্ষুণি শুরু করছি, আপনারা একটু চুপ করুন।"

জনতা চুপ হয়ে গেল।

অভিনয় শুরু হল। গ্রীঁগোয়ার অন্তরালে থেকে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল। তার মনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। একদিকে ভয়, অন্য দিকে আশা। অভিনয়ের সাফল্যের উপর তার ভাগ্য নির্ভর করছে।

অভিনয় বেশ জমে উঠল। দর্শকরা তন্ময়। এমন সময় দর্শকদের মধ্য থেকে একজন ভিখারী চিৎকার করে উঠল—"দয়া করে কিছু ভিক্ষা দিন।"

ভিখারীর দেহের বসন ছিন্ন, ডান হাতে গভীর ক্ষত। তা থেকে রক্ত পড়ছে। দেখলেই মনে দয়া হয়। একজন দর্শক তার দিকে একটা ফ্রাঁ ছুড়ে দিল। সে উপুড় হয়ে তা কুড়িয়ে নিয়ে আবার সেই একই চিৎকার শুরু করল।

বেশির ভাগ দর্শকদের আর অভিনয়ের দিকে মন রইল না। তারা ভিখারীকে দেখতে লাগল।

গ্রীঁগোয়ার মনে মনে বিষম চটে গেল। কিন্তু এই উৎপাত চুপ করে সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

অভিনেতারা তাদের অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিল। গ্রীঁগোয়ারের

কথায় আবার তা শুরু হল। একবার ব্যাঘাত ঘটলে সেই ভাঙ্গা নাটক জমিয়ে তুলতে একটু সময় লাগে। অভিনেতারা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু গ্রাঁগোয়ারের ভাগ্যই খারাপ। এবার বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দিকের দরজাটি খুলে গেল। ঘোষক ঘোষণা করল, "মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয় আসছেন।"

প্রায় একই সময়ে ফ্ল্যাণ্ডার্সের রাজদূত ও তাঁর দলবল নিয়ে প্রবেশ করলেন।

দর্শকদের মন আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তারা সবাই রাজদূত ও কার্ডিনালকে দেখবার দিকেই ঝুঁকে পড়ল।

দ্বিতীয়বার অভিনয়ে বাধা পড়ল। বাকীটুকু শেষ হবার আর আশা রইল না। গ্রাঁগোয়ারের এত সাধের নাটকটির অপমৃত্যু ঘটল, তার সব কবিত্ব মাঠে মারা গেল।

আশ্চর্য জনতার মন! খানিক আগে যারা নাটক দেখবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, দুদণ্ড না যেতেই একটা ভিখারী তাদের কাছে নাটকের চাইতেও বেশী আকর্ষণের বস্তু হয়ে পড়ল। এখন আবার কার্ডিনাল আর রাজদূত দেখবার আগ্রহে নাটকের দিকেও আর তারা ফিরেও চাইল না।

অভিনয় অবশ্য চলছিল, কিন্তু কেউ সে দিকে মন দিচ্ছিল না! রাজদূতদের একজন বলেই ফেললেন, "মঞ্চের উপর কি যে তামাশা হচ্ছে, কিছু বুঝাই যাচ্ছে না। দেখছি সব যুদ্ধের পোশাক পরা— কিন্তু যুদ্ধ কোথায়। শুধু বাক্‌যুদ্ধ! এর চাইতে অভিনয় বন্ধ করে মূর্খদের পোপ নির্বাচন শুরু হোক্। তাতে বরঞ্চ খানিকটা রস পাওয়া যাবে।"

সবাই একবাক্যে এ প্রস্তাব সমর্থন করল। তাদের তুমুল হর্ষধ্বনিতে গ্রাঁগোয়ারের সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে গেল। অভিনেতারা তাদের অভিনয় বন্ধ করে দিল। লজ্জায় দুঃখে অপমানে গ্রাঁগোয়ার দুই হাতে তার মুখ ঢাকল।

। ৫ ।

এদিকে মুহূর্তের মধ্যে বিপুল উৎসাহে পোপ. নির্বাচনের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হল। নির্বাচনের নিয়ম হল, প্রতিযোগীরা তাদের মুখ ঢেকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করবে। প্রকোষ্ঠটির শুধু একটি মাত্র জানালা। প্রতিযোগীরা এক এক করে তাদের মুখের আবরণ সরিয়ে সেই জানালা দিয়ে তাদের মুখ দেখাবে। যার চেহারা সব চেয়ে কদাকার, যার মুখভঙ্গী সব চাইতে বীভৎস ও হাস্যকর হবে, সেই হবে নির্বাচিত।

দর্শকদের বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত যে সবচেয়ে কুৎসিত বলে পোপ নির্বাচিত হল, সে কোয়াসিমোদো। তাকে দেখে দর্শকদের সে কি আনন্দ-উচ্ছ্বাস! ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবার মত এমন আর কাকে পাবে?

যার যা মনে আসে, কোয়াসিমোদোকে, সে তাই বলতে লাগল।

কোয়াসিমোদো নির্বিকার। তার মুখে কোন কথা নেই।

"হাঁদারাম, তুই কালা নাকি!"

কোয়াসিমোদো চুপ করেই রইল।

"চেহারাখানা দেখ! একেবারে আহা মরি। ব্যাটার মুখের দিকে চাও, দেখবে পিঠে কুঁজের বোঝা। তাকে হাঁটতে বলো, দেখবে খোঁড়া। তাকে কথা বলতে বলো, দেখবে বোবা। কানেও বুঝি কালা। সব দিক দিয়েই গুণের সাগর!"

একদিকে এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণ, অন্যদিকে আর এক দল তার সাজসজ্জা শুরু করল। যেমন পোপ, তার তেমনি পোশাক। মাথায় রাংতার মুকুট, হাতে ক্রুশদণ্ড, পরনে নোংরা কাপড়।

কোয়াসিমোদো কোনরকম আপত্তি করল না। বরঞ্চ খুশী মনেই এই আনন্দের অত্যাচার সইতে লাগল। সাজসজ্জা শেষে তাকে একটা ভাঙা দোলায় বসিয়ে তা কাঁধে নিয়ে সবাই শোভাযাত্রা করে পথে বেরুল। প্যালে দ্য জাস্টিস্ একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল।

চারদিকে সুগঠিত সুন্দর নরনারীর ভিড়ের মধ্যে দোলায় চেপে চলতে চলতে কোয়াসিমোদোর মনে এক ধরনের ঈর্ষ্যা মেশানো আনন্দের সঞ্চার হল। মুখে তা প্রকাশ পেল না।

শোভাযাত্রার সব আগে টাট্টুঘোড়ায় চেপে যে ব্যক্তিটি বেশ একটু গর্বিতভাবে যাচ্ছিল, দলের মধ্যে সেই প্রধান। পরনে ময়লা কাপড়, তাও ছেঁড়া। মিশরের ডিউক—এই তার পরিচয়। তার ঘোড়ার লাগাম আর জিন ধরে হেঁটে হেঁটে চলেছে তার পারিষদ দল। তাদের পিছনে মিশরের নরনারী—বেদে আর বেদেনী। কোলে কাঁধে উলঙ্গ শিশুর দল।

ডিউক থেকে শুরু করে সবার কাপড়চোপড়ই ময়লা, তালিমারা। কেউ কেউ চটকদার কাপড়ের তালি লাগিয়ে তার সেই ময়লা কাপড়কে একটু সুন্দর করবার চেষ্টা করেছে।

তাদের পেছনে ভিক্ষুকবাহিনী। একসঙ্গে চারজন করে চলছে। তাদের অনেকেই অল্পবিস্তর বিকলাঙ্গ। কেউ খুঁড়িয়ে হাঁটছে, কারও একটা হাত নেই। কিন্তু কারুরই উৎসাহের কমতি নেই।

এই দলে একজন রাজাও আছে। তারও ওই একই পোশাক। সে একটা কুকুরটানা ভাঙা গাড়ির মধ্যে বেশ আরাম করে বসে আছে। তার পিছনে আর একদল নোংরা পোশাক পরে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে চলেছে।

এই শোভাযাত্রায় যত রাজ্যের যত ভবঘুরে, যাযাবর, আর ভিখারীর সমাবেশ। আর আজ এদেরই মধ্যমণি হয়ে এদেরই কাঁধে চড়ে চলেছে তাদের নির্বাচিত পোপ, নোৎরদাম গির্জার ঘণ্টাবাদক কুব্জপৃষ্ঠ কোয়াসিমোদো। মাথায় রাংতার টুপি, হাতে ক্রুশদণ্ড।

৷ ৬ ৷

শীতকালের বেলা দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেল। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

এই শীতের সন্ধ্যায় গ্রীঁগোয়ার একা চলেছে। তার শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। ছয়মাস তার ঘরভাড়া বাকী। ভাড়ার টাকা না মিটিয়ে ঘরে ফিরবার উপায় নেই।

বড় আশা ছিল, তার নাটকটি সাফল্যমণ্ডিত হবে, মোটা পুরস্কার পাওয়া যাবে। সেই টাকা দিয়ে ভাড়া মিটাবে, কিছুদিনের জন্য অন্নের সমস্যাও ঘুচবে। কিন্তু এমনই ভাগ্য! সব আশাই বিফলে গেল!

রাত বাড়বার সাথে সাথে শীতও বাড়তে লাগল। তার সামান্য পোশাক নিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে চলল। কিন্তু এর উপরও আর এক বিপদ ঘটল। পথে এক জায়গায় জলের ঝাপটা লেগে তার এই সামান্য পোশাকও একেবারে ভিজে গেল। ফলে তার হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি শুরু হল।

এই শীত থেকে আত্মরক্ষার আশায় সে গ্রীভের দিকে চলল। সেখানেও আজ বহ্ন্যুৎসব চলছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আর তার চারদিকে নরনারীর দল। অগ্নিশিখার রক্তিমাভায় ক্ষণে ক্ষণে তাদের চোখ মুখ অপরূপ দেখাচ্ছে।

কাছে এসে গ্রীঁগোয়ার দেখল, শুধু বহ্ন্যুৎসবই নয়, এখানে আরও একটি আকর্ষণ আছে। বহ্ন্যুৎসবের চাইতে সে আকর্ষণই বেশী।

অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে বৃত্তাকারে সবাই দাঁড়িয়ে। আর সেই বৃত্তের মধ্যে একটি তরুণী নাচছে। তরুণী দীর্ঘাঙ্গী নয়, কিন্তু তার অপরূপ দেহ-ভঙ্গীমায় তাকে দীর্ঘাঙ্গী বলেই মনে হয়। তার গায়ের রং বাদামী। কিন্তু দিনের আলোয় সে রং স্বর্ণাভ উজ্জ্বল দেখায়। তার পা দুখানিই বা 'কী সুন্দর! আর পায়ের জুতা জোড়াটিই বা কি চমৎকার!

তরুণী একখানা পুরানো গালিচার উপর দাঁড়িয়ে লীলায়িত ছন্দে নাচছিল। নাচের তালে তালে তার অপরূপ মুখখানি যার উপর পড়ছিল, সেই মনে মনে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করছিল।

তার হাতে একটি তাম্বুরিন। তা থেকে সুমধুর সুরলহরীর সৃষ্টি হচ্ছিল। আর সাথে সাথে সে লঘুপদে সুচারু ছন্দে অপরূপ নৃত্য করছিল।

দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ। কারও মুখে কথা নেই। কোথাও একটু গুঞ্জন পর্যন্ত নেই। গ্রীঁগোয়ারের মনে হল, পাতালকন্যা বা সুরাঙ্গনাও বুঝি এমন ত্বরিত পদে, এমন লঘু ছন্দে, এমন ললিত নৃত্য করতে পারবে না।

এক সময় তরুণীর মাথা থেকে একটা পিতলের কাঁটা খসে পড়ল। তাই দেখে তার স্বপ্ন ভাঙল। সে বুঝল, তরুণী দেববালাও নয়, অপ্সরী কিন্নরীও নয়। সামান্য একটা বেদের মেয়ে মাত্র।

হোক্ বেদের মেয়ে! তবুও তার আকর্ষণ বড় কম নয়। অদূরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের রক্ত আভা ক্ষণে ক্ষণে তার মুখে পড়ে তার অপরূপ রূপকে আরও মোহময় করে তুলছে।

কাঁটাটি কুড়িয়ে নিয়ে তরুণী আবার নৃত্য শুরু করল। এবারের নৃত্য একটু নূতন ধরনের। সে দুইখানি তরবারি সোজা করে তার ললাটের উপর রেখে নাচতে লাগল। নৃত্যের তালে তালে দেহলতা যে দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তরবারি দুখানি তার বিপরীত দিকে ঝুঁকছে —তবু মাটিতে পড়ছে না। যেমন অপরূপ নৃত্য, তেমন অপরূপ এই তরবারির খেলা!

জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন তাকে তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। তার বিহ্বলতা আর সবার চাইতে বেশী।

লোকটির চেহারা রুক্ষ, মুখ মলিন, অথচ দৃষ্টি স্থির। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়। এরই মধ্যে মাথায় টাক পড়েছে। কানের দুই পাশে সামান্য যে কয়েক গুচ্ছ চুল আছে তাতে পাক ধরেছে। তার চওড়া কপাল বলি-রেখা-চিহ্নিত, চক্ষু কোটরাগত। অথচ সেই

চক্ষু থেকে যেন তরুণের চাঞ্চল্য আর কামনার বহ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সবার মত সেও মেয়েটির নাচ দেখছিল। কিন্তু নাচের চাইতে মেয়েটির উপরই যেন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তার মলিন মুখে মাঝে মাঝে মৃদু হাসির আভাষ দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু সে যেন হাসি নয়, দীর্ঘশ্বাস!

নাচতে নাচতে তরুণী এক সময় শ্রান্ত হয়ে পড়ল। সে তখন গালিচার উপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। জনতা করতালি দিয়ে তাকে তাদের অভিনন্দন জানাল।

তরুণী তখন মধুর স্বরে ডাকল, "জালি।"

সে ডাক শুনে একটি ছাগল ক্ষিপ্রপদে তরুণীর দিকে অগ্রসর হল। তার গায়ের লোম সাদা, শিং এবং পায়ের ক্ষুর সোনালী রং-এ পালিশ করা, গলায়ও একটি সোনালী রং-এর গলাবন্ধ। এতক্ষণ ছাগলটি গালিচার এক কোণে শুয়ে শুয়ে তার মনিবের নাচ দেখছিল।

তরুণী ছাগলটিকে একটু আদর করল। তার পর বলল, "জালি, এবার তোমার পালা।"

এই বলে তাম্বুরিনটি জালির সামনে ধরে জিজ্ঞেস করল, "জালি, এটা কি মাস?"

ছাগলটি তার সামনের পা দিয়ে তাম্বুরিনের উপর একবার আঘাত করল।

সবাই বুঝতে পারল, এটা যে বছরের প্রথম মাস, অর্থাৎ জানুয়ারী —একটি আঘাতে সে তাই বুঝাতে চাচ্ছে।

সবাই তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অবাক্ হল।

তরুণী তাম্বুরিনটি আর এক ভাবে ধরে আবার জিজ্ঞেস করল, "জালি, আজ কি বার?"

জালি এবার তাম্বুরিনে ছয়বার আঘাত করল।

সবাই আর একবার অবাক্ হল। কারণ সেদিন সপ্তাহের ষষ্ঠবার অর্থাৎ শনিবার।

তরুণী আবার প্রশ্ন করল, "জালি, এখন কটা বেজেছে?"

তাম্বুরিনটি এবার তার এক পাশে ধরা।

এবার জালি তাম্বুরিনে সাতবার আঘাত করল। আর সঙ্গে সঙ্গে অদূরে ক্লক টাওয়ারের ঘড়িতে সাতটা বাজল।

বিমুগ্ধ দর্শক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

সেই টাকপড়া লোকটি শুধু গম্ভীর সুরে বলল, "নিশ্চয়ই এর মধ্যে জাদুর ভেলকি আছে।"

তরুণীর কানে সে কথা যেতেই সে শিউরে উঠল। ভয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরাল। কিন্তু জনতার আনন্দ-কোলাহলে তার ভয় নিমিষেই দূর হয়ে গেল। সে আবার তার খেলা শুরু করল। সে তাম্বুরিনটি একটি নূতন ভঙ্গীতে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "জালি শহরের শান্তিরক্ষার যিনি কর্তা, তিনি শোভাযাত্রার সময় কেমন করে হাঁটেন?"

জালি তার পিছনের পা দুটির উপর দাঁড়িয়ে এমন অদ্ভুত ভাবে হাঁটতে লাগল যে, দর্শকরা হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

"সরকারী এটর্নি কেমন করে বক্তৃতা করেন?"

এবার জালি পিছনের পা দুটির উপর বসে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল।

দর্শকদের মধ্যে আবার হাসির রোল উঠল।

সেই টাকপড়া লোকটির মুখে কিন্তু বিরক্তির ছায়া! সে চিৎকার করে বলে উঠল, "শাস্ত্রের নিষেধ না মেনে জাদুর খেলা দেখানো! এ যে চূড়ান্ত বেয়াদপি!"

তরুণী এবার লোকটির দিকে মুখ ফিরাল। তারপর আপন মনেই বলল, "হতভাগা, এখানেও আমায় জ্বালাতে এসেছে!"

এই বলে সে জালিকে প্রশ্ন করা বন্ধ করল এবং দর্শকরা তার নাচ ও খেলা দেখে তাকে যে পয়সা দিয়েছে, তাই কুড়াতে শুরু করল।

সে সব কুড়ানো শেষ হলে সে দর্শকদের কাছে হাত পাততে লাগল। দর্শকরাও কিছু কিছু তার হাতে দিল।

শেষ অবধি সে গ্রীঁগোয়ারের কাছে এসে হাত পাতল। গ্রীঁগোয়ার অন্যমনস্ক ভাবে তার পকেটে হাত দিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, তার পকেটে একটা কানাকড়িও নেই। তরুণী তখনও তার সামনে হাত পেতে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রীঁগোয়ার কি যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমন সময় অদূরে টুঁ-রোলা থেকে কাংস্য কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল, "এই মিশরের পঙ্গপাল, মর, দূর হ।"

তরুণী আতঙ্কে শিউরে উঠল।

সেখানে যে সব ছেলে মেয়ে ছিল, তারা এই চিৎকার শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, "আরে এ যে টুঁ-রোলার বুড়ীর গলা। আজ বুঝি তার সারাদিন খাওয়া জোটেনি। চল্ দেখি ওর জন্য কিছু খাবার মেলে কিনা।"

এই বলে তারা শহরের পথে ছুটে চলল।

॥ ৭ ॥

এই সুযোগে গ্রীঁগোয়ারও সরে পড়ল। ছেলেদের কথা শুনে তারও তখন মনে পড়ল, সেও আজ সারাদিন অভুক্ত। তার পেট জ্বলতে লাগল। এই পেটের জ্বালা নিয়েই সে চলতে শুরু করল।

কিছু দূর যেতেই তার কানে ভেসে এল এক স্বর্গীয় সংগীত-লহরী। সেই নর্তকী তরুণীর সুধা কণ্ঠ। তার নৃত্যে যেমন অপরূপ ছন্দের লীলা, তার কিন্নর কণ্ঠেও সেরূপ সুরের মূর্ছনা ;—এই কোমলে এই কড়িতে। গ্রীঁগোয়ার ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হয়ে তন্ময় হয়ে সেই অপূর্ব সংগীত শুনতে লাগল।

কিন্তু টুঁ-রোলার বৃদ্ধার কাংস্যকণ্ঠ আবার শোনা গেল।—"এই হারামজাদী, চুপ কর্।"

চারপাশে দাঁড়িয়ে যারা তার গান শুনছিল, তারা বৃদ্ধার উপর খাপ্পা হয়ে উঠল। বলল, "বুড়ীর মরণও নেই!"

তারা হয়ত তাকে আরও গালি দিত। কিন্তু তখন আর সে সুযোগ রইল না। কারণ মূর্খদের পোপের শোভাযাত্রা এদিকেই আসছে।

শোভাযাত্রীদের মধ্যে কয়েকটি দল। তাদের এক এক দলের এক এক রকম গান, এক এক রকম বাদ্যযন্ত্র। তাদের সে গান শুনে তা গান না চিৎকার বোঝা শক্ত।

কাঠের দোলায় উপবিষ্ট পোপবেশী কোয়াসিমোদোর নিস্তরঙ্গ জীবনে এই বৈচিত্র্য কোন উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল কিনা বলা কঠিন।

ভাগ্য জন্মাবধি তাকে পরিহাসই করেছে। পদে পদে সে সকলের কাছ থেকে পেয়েছে শুধু লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপহাস বিদ্রূপ। তাই কোন কিছুর উপরই তার তেমন আকর্ষণ ছিল না। তার নিজের উপরও না।

কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটল। যদিও তার বধির কর্ণে শোভাযাত্রী-দের উল্লাসধ্বনি প্রবেশ করছিল না, তবুও তাদের চোখ মুখের ভঙ্গী দেখে নিজেও আনন্দ বোধ করছিল। যে শোভাযাত্রার সে আজ প্রধান আকর্ষণ, হোক্ তা চোর জোচ্চোর, ভিখারী ভিক্ষুক, ভবঘুরের শোভাযাত্রা, তবু তারাও মানুষ। আর সে মানুষদেরই সে আজ নির্বাচিত পোপ! ঠাট্টা করেও আজ তাকে যে সম্মান দেখান হচ্ছিল, তা সে সহজ ভাবেই গ্রহণ করল।

কোয়াসিমোদো যখন এমন আত্মশ্লাঘায় মগ্ন, সুখ-স্বপ্নে বিভোর, তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তার হাত থেকে পোপের মর্যাদার প্রতীক সোনালী গিল্টি করা ক্রুশদণ্ডটি কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। তার মাথার রাংতার মুকুটটিরও সেই একই দশা হল।

এ সেই টাক পড়া ব্যক্তি, যে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেদে মেয়েটির নাচ দেখছিল, আর মাঝে মাঝে তাকে গালি দিচ্ছিল। তার পরিধানে ধর্মযাজকের পোশাক।

গ্রীঁগোয়ারের দৃষ্টি তার উপর পড়তেই সে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, “এ কি আপনি! মঁসিয়ে ক্লঁ্যদ ফ্রোলো, নোৎরদাম গির্জার আর্চডিকন্।”

পরক্ষণেই ভাবল, এই রাক্ষসটার পেছনে কেন? সে যে তাকে একেবারে গিলে ফেলবে।

অন্য সবার মনেও সেই একই ভয়। এই বুঝি কোয়াসিমোদো বাঘের মত তাঁর উপর লাফ দিয়ে পড়ে তাঁর ঘাড় ভেঙে দেয়। মেয়েরা ভয়ে চোখ বুজল, পাছে সে দৃশ্য দেখতে হয়!

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! কোয়াসিমোদোর বিন্দুমাত্র রাগ বা বিরক্তি দেখা গেল না। বরঞ্চ সে লাফ দিয়ে দোলা থেকে নেমে ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। তিনি দণ্ডদাতার মত রুক্ষ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

দুজনের মধ্যে মুখে কোন কথা হল না বটে, কিন্তু চোখে চোখে তাদের অনেক কথা হয়ে গেল। ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর ইঙ্গিতে কোয়াসি-মোদো উঠে দাঁড়াল এবং পোষা কুকুরের মত তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুইজনই চোখের আড়াল হল।

আর সবার মতই গ্রীঁগোয়ারও কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। যে দৈত্যটি ইচ্ছা করলেই তার বজ্রমুষ্টিতে ক্লঁ্যদ ফ্রোলোকে এক নিমিষে চূর্ণ করে দিতে পারত, তার সে ইচ্ছা যে কেন হল না, কেউ তা বুঝতে পারল না।

এদিকে গ্রীঁগোয়ারের জঠরজ্বালা আবার বেড়ে উঠল। কোথায় খাবার পাওয়া যাবে, তাই তার প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়াল।

॥ ৮ ॥

দিশেহারা গ্রীঁগোয়ার শেষ অবধি স্থির করল, সে বেদের মেয়েটিকেই অনুসরণ করবে।

তরুণী আগে আগে চলছে। সাথে তার প্রিয় জালি। দু'জনে যেন দুটি সমবয়সী সখী। গ্রীঁগোয়ার একটু দূর থেকে তাকেই অনুসরণ করে চলেছে।

আঁকাবাঁকা, সরু চওড়া কত পথ পার হল, তবু পথের শেষ নেই। কোথায় যাচ্ছে তাও সে জানে না। ক্রমে পথ অন্ধকার ও জনবিরল হয়ে এল। এভাবে চলতে চলতে তারা শেষে গ্রীভের বধ্যভূমির কাছে হাজির হল। একজন লোক অন্ধকারে তাকে অনুসরণ করছে দেখে তরুণীটির মনে সন্দেহ উপস্থিত হল। তাই খানিক পরপরই সে পিছন ফিরে ফিরে দেখতে লাগল। একবার একটি দোকানের কাছে এসে সে থামল এবং গ্রীঁগোয়ারের আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল। তার চোখে তখন অস্বস্তি ও আশঙ্কার ছায়া।

গ্রীঁগোয়ার এতক্ষণ দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন ছিল। শূন্য উদরে এ ছাড়া আর কিই বা করা যায়! মেয়েটির মুখের ভাব দেখে তার সে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তার সাথে চলবার উৎসাহও কমে এল। তাই তার গতিও শ্লথ হল।

এ পথটিও আঁকাবাঁকা। তাই একটা বাঁক ঘুরতেই মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। কিন্তু পরক্ষণেই তার আর্তচিৎকার তার কানে ভেসে এল।

গ্রীঁগোয়ার তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। গাঢ় অন্ধকারে পথ ভাল করে দেখা যায় না, তাই আন্দাজে চলা ছাড়া উপায় ছিল না। ভাগ্যক্রমে সে এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হল, যেখানে পথের ধারে মেরী মাতার পাথরের মূর্তি, আর তারই সামনে একটা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা জায়গায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের ক্ষীণ

আলোকে সে দেখল, একটু দূরে দুই জন পুরুষ মেয়েটিকে চেপে ধরেছে। মেয়েটি তাদের সাথে ধস্তাধস্তি করছে, তাদের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। আর লোক দুটি তার মুখ চেপে আছে যাতে সে চিৎকার না করতে পারে। ছাগলটি ভয় পেয়ে কাতর কণ্ঠে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করছে।

এই দৃশ্য দেখে গ্রীঁগোয়ার তার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গেল। তার ক্ষীণ দেহেও পৌরুষ জেগে উঠল। "প্রহরী! প্রহরী!" বলে চিৎকার করতে করতে সে ঘটনাস্থলে হাজির হল। গিয়ে দেখে দুজনের একজন কোয়াসিমোদো। তাকে দেখে গ্রীঁগোয়ার পালাল না বটে, কিন্তু এগুতেও সাহস পেল না। কিন্তু এতেও সে রেহাই পেল না। কোয়াসিমোদো দৌড়ে এসে তাকে এমন ঘুষি মারল যে, সে আট দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তার পর মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তন্বী তরুণী সেই বিশালদেহ দৈত্যের দেহে একটি পাতলা রেশমী চাদরের মত ঝুলতে লাগল। তার সঙ্গীও তার সাথে চলল। ছাগলটি চিৎকার করতে করতে তাদের পেছনে পেছনে লাফাতে লাফাতে চলল।

কিছু দূর গিয়ে মেয়েটি একটু সুযোগ পেয়ে চিৎকার শুরু করল, "রক্ষা করো, বাঁচাও। আমায় খুন করল।"

ভাগ্যক্রমে একজন অশ্বারোহী সেনা-পুরুষ তার দলবল নিয়ে তখন সেখান দিয়েই যাচ্ছিল। তার হাতে একখানি তরবারি, মাথায় শিরস্ত্রাণ।

সে জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ দিল, "এই শয়তান! মেয়েটাকে ছেড়ে দে।"

বলেই সে মেয়েটিকে কোয়াসিমোদোর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার ঘোড়ার উপরে তুলে নিল।

কোয়াসিমোদো এই পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই সে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার পরই আবার মেয়েটিকে ধরবার জন্য অশ্বারোহীর দিকে এগিয়ে এল।

তৎক্ষণাৎ পনের ষোল জন সৈন্য চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল এবং শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

এই অশ্বারোহী ক্যাপ্তেন ফিবাস্। আর এই সেনাদল তারই অনুচর! রাতের বেলায় শহর পাহারা দেওয়াই তাদের কাজ।

কোয়াসিমোদো প্রথমে বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করল। শেষে হতোদ্যম হয়ে সে চেষ্টা ত্যাগ করল। কিন্তু হাত পা বাঁধা অবস্থায়ও তার আস্ফালন কমল না। রুদ্ধ আক্রোশে বিকট গর্জনে সে রাতের অন্ধকারকে মুখর করে তুলল। তার সে কি ক্রোধ! সে কি বীভৎস মূর্তি!

রাত্রিকাল, তাই রক্ষে। দিনের আলোয় সে মূর্তি দেখলে ক'জন সৈন্য তার সামনে এগিয়ে আসতে সাহস করত, বলা শক্ত, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তার সে অমোঘ অস্ত্র—তার কুৎসিত আকৃতির বীভৎসতা কোন কাজেই লাগল না। তারা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে শক্ত করে বাঁধতে লাগল, আর এই সুযোগে তার সঙ্গীটি পালিয়ে গেল।

বেদের মেয়েটি ঘোড়ার পিঠে বেশ আরাম করে বসল এবং তার দুটি মৃণাল বাহু দিয়ে সেনা পুরুষটির গলা জড়িয়ে ধরল। তার পর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অশ্বারোহীর সুশ্রী সুগঠিত দেহ-সৌন্দর্যে সে যে মুগ্ধ এবং এ বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য যে সে কৃতজ্ঞ, সে যেন তার সেই অপলক দৃষ্টি দিয়ে তা-ই বুঝাতে চাচ্ছিল।

একটু পরে সাহস করে সে জিজ্ঞেস করল, "আমার ত্রাণ-কর্তার নামটি জানতে পারি কি?"

"ক্যাপটেন ফিবাস্।"

এই বলে ক্যাপটেন যখন সগর্বে তার গোঁফে তা' দিচ্ছিলেন, সেই ফাঁকে মেয়েটি এক লাফে মাটিতে পড়ে বিদ্যুৎগতিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যাবার আগে অবশ্য ক্যাপটেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

ফিবাস্ তখন কোয়াসিমোদোকে আরও শক্ত করে বাঁধবার হুকুম দিয়ে বলল, "মেয়েটাকেও ধরে রাখলে হত।"

॥ ৯ ॥

এদিকে গ্রীঁগোয়ার অনেকক্ষণ অচৈতন্য হয়ে রাস্তার উপর মেরী মাতার মূর্তির সামনে পড়ে রইল। তার পর জ্ঞান ফিরে এলে বেদের মেয়েটির নৃত্য, তার ছাগল জালি, কোয়াসিমোদোর বীভৎস মূর্তি, তার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত—অস্পষ্ট ছায়াছবির মত একে একে তার মনে পড়তে লাগল।

আরও একটু পরে সে টের পেল, তার শরীর যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর সে একটি নর্দমার উপর পড়ে আছে।

মনে মনে কোয়াসিমোদোকে অভিসম্পাত করতে করতে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু অসাড় দেহে তা সম্ভব হল না। এদিকে নর্দমার দুর্গন্ধে তার প্রাণ যায়! তাই আর কোন উপায় না পেয়ে এক হাতে তার নাক চেপে সে সেখানেই চুপ করে পড়ে রইল।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ তার ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর কথা মনে পড়ল। আর অমনি চোখে ভেসে উঠল, বেদের মেয়েটির সাথে কোয়াসিমোদো আর তার সঙ্গীর ধস্তাধস্তি। তার কেবলই মনে হতে লাগল, কোয়াসি-মোদোর সঙ্গী আর কেউ নয়—আর্চডিকন ক্লঁ্যদ ফ্রোলো। অথচ তাই বা কি করে সম্ভব?

এদিকে ঠাণ্ডার প্রকোপ বেড়েই চলল। তার মনে হল, মৃত্যুর বুঝি আর দেরি নেই।

তার যখন এমন সংকটাপন্ন অবস্থা, তখন একদল ছেলে মহা উৎসাহে একটা তোশক টানতে টানতে এদিকেই আসছে, দেখা গেল। তারা এমন হট্টগোল করছে যে তাতে মরা মানুষ বেঁচে ওঠবার কথা।

গ্রীঁগোয়ার শুনল, তারা বলছে, মোড়ের মাথায় লোহাওয়ালা কোন্ এক বুড়ো মারা গেছে! তার তোশকটি পুড়িয়েই তারা আজ বহ্ন্যুৎসব পালন করবে।

এ কথা শেষ হতে না হতেই তারা তোশকটি নর্দমার উপর ছুড়ে মারল, আর পড়বে তো পড়, একেবারে গ্রীঁগোয়ারের মাথার উপর গিয়ে পড়ল।

ছেলেরা তাকে দেখতে পায়নি। কে আর ভাবতে পারে যে, এই শীতের রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে নর্দমার দুর্গন্ধ শোঁকবার জন্য কেউ সেখানে শুয়ে থাকতে পারে।

একটি ছেলে তোশকের এক কোণ ছিঁড়ে আগুন লাগাতে গেল। গ্রীঁগোয়ারের তখন উভয় সংকট! নীচে নর্দমার ময়লা জল আর দুর্গন্ধ, আর উপরে আগুনে পুড়ে মরার আশঙ্কা। কোনটাই সুখের নয়।

তাই সে তখন শরীরের শেষ শক্তিটুকু সম্বল করে উঠে দাঁড়াল, এবং তোশকটি ছেলেদের দিকে ছুড়ে মেরে দৌড়াতে শুরু করল।

হতচকিত ছেলের দল ভাবল, লোহাওয়ালার ভূত বুঝি এতক্ষণ তোশকটার ভিতর লুকিয়ে ছিল! ভয়ে তারাও দৌড়াতে লাগল।

গ্রীঁগোয়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। অন্ধকার পথে কোন্ দিক্ দিয়ে কোথায় গেল, কিছুই বুঝতে পারল না। তা ছাড়া কোথায় যাবে, তাও জানা নেই।

একে সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি, তার উপর এই পরিশ্রম! শরীরে আর কত সহ্য হয়! তাই হাঁপাতে হাঁপাতে এক জায়গায় বসে পড়ল। তখন মনে হল, সে কি বোকামি করেছে! ছেলের দল তার চোখের উপরই চারদিকে পালিয়ে গেছে। কাজেই তার এভাবে পালিয়ে বেড়াবার কোন মানেই হয় না।

বরঞ্চ তোশকখানি যদি পায়, তবে এই শীতের রাতে একটু আরাম করে ঘুমাতে পারে। আর তারা যদি তাতে আগুনই লাগিয়ে থাকে, তা হলেই বা ক্ষতি কি! অন্ততঃ শরীরটা গরম করা যাবে।

এই ভেবে সে আবার আগের পথেই ফিরে চলল। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার উপর পথও ভাল জানা নেই। তাই কিছুদূর গিয়েই সে পথ হারিয়ে ফেলল। একই পথে সে বারবার ঘুরতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ অদূরে আগুনের ক্ষীণ আভা তার চোখে পড়ল। সে ভাবল, তোশকখানাই জ্বলছে, আর এ বুঝি তারই আলো। সে সেদিকেই চলল।

॥ ১০ ॥

কিছুদূর গিয়েই তার ভুল ভাঙল।

সে দেখল, সে কাঁচা পথে এসে পড়েছে। এ পথ স্যাঁতসেঁতে, জলকাদায় ভরতি। তা ছাড়া পথটি ক্রমেই ঢালু হয়ে নীচের দিকে নামছে। কাদার পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে।

যেতে যেতে নানা অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়তে লাগলো। অন্ধকারে কতগুলি সরীসৃপ যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। তারা মানুষ না পশু, দূর থেকে বুঝবার উপায় নেই।

খালি পেট অনেক সময় মানুষকে দুঃসাহসী করে তুলে। তাই সে পা চালিয়ে সেই চলমান জীবগুলির কাছে গিয়ে দেখে, তারা মানুষই বটে, তবে সম্পূর্ণ মানুষ নয়। কারও পা নেই, কারও হাত নেই, কারও হাত-পা দুই-ই নেই, কেউ অন্ধ, কেউ বা খোঁড়া। সব বিকলাঙ্গ মানুষের মিছিল।

গ্রীঁগোয়ারের কাছে এ দৃশ্য ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠল। আর কোন উপায় না দেখে সে দৌড়াতে শুরু করল। অবাক্ কাণ্ড! সেই বিকলাঙ্গের দলও অমনি তার পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল।

তিনটি মূর্তি প্রথম থেকেই তার সঙ্গ নিয়েছিল। এতক্ষণে আর সবাইও তাকে ঘিরে ফেলল। সবাই বিকলাঙ্গ। এদের কি মতলব বুঝতে না পেরে গ্রীঁগোয়ার মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। তার ভাগ্যে কি আছে কে জানে? আপাততঃ এদের হাত থেকে তো রেহাই পেতে হবে। তাই সে তখন কাউকে ডিঙিয়ে, কাউকে মাড়িয়ে, কাউকে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগল। ভয়ে তার বুক

শুকিয়ে গেল, তার মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হল, সে বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে !

যাহোক্ এই দুঃসহ পথ শেষ হল। সে একটা প্রশস্ত চত্বরের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে শত শত দীপ জ্বলছে, আর তাদের ক্ষীণ আলোকশিখা অন্ধকারে দুলে দুলে উঠছে।

সে তাড়াতাড়ি চত্বরে প্রবেশ করল। অবাক হয়ে দেখল, কেউ আর বিকলাঙ্গ নয়। প্রায় সবাই সুস্থ সমর্থ জোয়ান মানুষ।

সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ আমি কোথায় এলাম ?"

"কোর্ট অব্ মিরাকলস্-এ।" একজন উত্তর দিল।

এ তো বড় আজব জায়গা ! এখানে অন্ধ তার দৃষ্টি ফিরে পায়, খঞ্জ দিব্যি হাঁটতে পারে, নুলো স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যায় ! এ সব তাজ্জব ব্যাপার যার বুদ্ধিতে হচ্ছে, সেই মহাপুরুষটি কে ?" কেউ কোন উত্তর দিল না, শুধু হাসতে লাগল।

বিমূঢ় গ্রীঁগোয়ার চারদিকে চেয়ে দেখল।

সত্যই এ কোর্ট অব্ মিরাকলস্ ! প্যারীর বুকে এ এক কুৎসিত ক্ষত। এমন সাংঘাতিক জায়গা যে, দিনের বেলা ছাড়া পুলিসও এখানে আসতে ভয় পায়।

যত রাজ্যের যত চোর, জুয়াচোর গুণ্ডা বদমাশের লীলাক্ষেত্র। এখানে যারা থাকে, এমন দুষ্কার্য নেই, যা তারা করে না। দিনের বেলায় এরা নানা সাজে নানা পোশাকে ভিক্ষা করে বেড়ায়। রাত হলেই তাদের আর এক মূর্তি ! তখন লুণ্ঠন, নরহত্যা, রাহাজানি, কোন কাজ করতেই এদের বাধে না।

প্রকাণ্ড চত্বর জুড়ে কোর্ট অব্ মিরাকলস্। এর চার পাশে পুরাতন জীর্ণ শ্রীহীন ভগ্ন গৃহ। কোনটি সম্পূর্ণ ভাঙা, কোনটির ভগ্নদশা সবে শুরু হয়েছে। কোনটির দরজা নেই, কোনটির জানালা নেই। কোনটির আবার ছাদ পর্যন্ত নেই। এখানে ওখানে জঞ্জালের স্তূপ।

এক জায়গায় কতগুলি ছোট শিশু কাদা মেখে চেঁচামেচি করছে।

আর এক জায়গায় মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে। কেউ অকারণে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছে। মোট কথা কেউ বসে নেই।

গ্রীঁগোয়ারের কাছে এ এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাজ্য। এখানে সবই বিচিত্র। এমন জায়গায় যে তাকে আসতে হবে, কোন দিনই তা ভাবেনি।

একজন চিৎকার করে বলল, "নূতন শিকারটাকে রাজার কাছে নিয়ে চল।"

এদেরও তাহলে রাজা আছে! সে বোধ হয় এদের মতই হতভাগ্য!—গ্রীঁগোয়ার মনে মনে ভাবল।

কয়েকজন তাকে টানতে টানতে রাজার কাছে নিয়ে চলল। তাদের টানাটানিতে তার শেষ সম্বল ছেঁড়া। জামাটি একবারে দু'টুকরো হয়ে গেল।

যেখানে তাকে আনা হল, সেখানে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চুল্লীতে আগুন জ্বলছে। তার উত্তাপে পাশে রাখা একটা তেপায়া লাল টকটক করছে।

অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে কতগুলি জরাজীর্ণ টেবিল। এই টেবিলের সামনে বসে কতগুলি লোক মাংস রুটি খাচ্ছে, আর হামলা করছে। আগুনের আভায় আর পানীয়ের ঘোরে তাদের চক্ষু লাল।

একদিকে এক বিশাল-বপু ব্যক্তি রঙ্গরসে মত্ত। কিছুদূরে এক সৈনিক শিস্ দিতে দিতে তার পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলছে। আসলে সে একজন ভবঘুরে, নকল সৈনিক সেজে ভিক্ষায় বেরিয়েছিল। দিব্যি সুস্থ চেহারা, পায়ে কোন ক্ষত নেই।

একটু দূরে একজন লোক ষাঁড়ের রক্তের সাথে আর একটা জিনিস মিশিয়ে একটা প্রলেপ তৈরি করছে। কাল তা পায়ে লাগিয়ে নকল ক্ষত তৈরি করে ভিক্ষায় বেরুবে। সাবান চিবিয়ে মুখে কি ভাবে ফেনা বার করতে হয়, কি ভাবে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়তে হয়, একজন তারই শিক্ষা নিচ্ছে।

জল্লাদের চাবুক তার পিঠে পড়তে লাগল—সপাং সপাং

চুরি করে আনা একটা ছেলেকে নিয়ে পাঁচজন স্ত্রীলোক তুমুল ঝগড়া করছে। পাশে একটা কালো কুকুর শুয়ে আছে।

সর্বত্র উদ্দাম হাসি, অশ্লীল গান। যার যা মনে আসছে, তাই বলে যাচ্ছে। কেউ শুনছে কিনা, কারও খেয়াল নেই।

এই কোর্ট অব্ মিরাকলস্। প্যারীর জীবন্ত নরককুণ্ড।

॥ ১১ ॥

অগ্নিকুণ্ডের কাছে কাঠের একটা খালি পিপে। তার উপর একজন বসে বসে ঝিমুচ্ছে। এই হল এ রাজ্যের রাজা আর পিপেটি তার রাজসিংহাসন।

গ্রীঁগোয়ারের তখন সঙ্গীন অবস্থা। ভয়ে সে রাজার দিকে মুখ তুলে চাইতেও পারছিল না। এরই মধ্যে একজন তার মাথা থেকে টুপিটি খুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। গ্রীঁগোয়ার নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাজা রাজোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—"এই শয়তানটাকে কোথায় পেলি?"

তার কথা শুনে গ্রীঁগোয়ার চমকে উঠল। তার মনে হল, অভিনয়ের সময় এই লোকটিই ভিখারীর বেশে সবার কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াচ্ছিল।

এবার সে সাহস করে রাজার মুখের দিকে চাইল। সেই ভিখারীই বটে, তবে এখন তার আলাদা চেহারা। তার হাতে এখন আর সে ক্ষত নেই। তার পরিবর্তে তার বলিষ্ঠ হাতে একটি চাবুক, মাথায় টুপি।

এই নরককুণ্ডের মধ্যে একে দেখে গ্রীঁগোয়ারের মনে তবু একটু ভরসা হল। তাকে উদ্দেশ করে বলল, "তোমায় রাজা বলব, না বন্ধু বলব বুঝতে পারছি না।"

"তোর যা ইচ্ছে তাই বল্। মোদ্দা কথা, তোর পক্ষে বলবার যদি কিছু থাকে আগে তাই বল্।"

"আমি তো কোন দোষ করিনি। আমি হচ্ছি আজ সকালের নাটকের"—

"ও সব বাজে কথা রাখ্। মনে রাখবি, তুই এখন তিনজন রাজা মহারাজার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস্। আমি ক্লোপিন্, টিউনিসের রাজা। মাথায় নেকড়া বাঁধা, এই হচ্ছে মিশরের ডিউক। আর ওই যে মোটা ভুঁড়ি, ও হচ্ছে গ্যালিলির সম্রাট্। আমরা তিনজন তোর বিচারক। তুই চোর, জোচ্চোর বদমাশ না হয়ে আমাদের রাজ্যে পা দিয়েছিস্, আমাদের নিয়ম ভঙ্গ করেছিস্, এজন্য তোকে শাস্তি পেতেই হবে। তবে যদি প্রমাণ করতে পারিস্, ভদ্র পোশাক পরলেও তুই চোর ভিখারী বা ভবঘুরে তবেই রেহাই পাবি। তুই এদের কোন্‌টা ?"

"কোনটাই নই। আমি শুধু কবি, নাট্যকার।"

"থাম্ থাম্। আর কাঁদুনি গাইতে হবে না। কোন গুণই যখন তোর নেই, তবে যা, ফাঁসিতে ঝুলে পড়। আমাদের জন্য তোদের ভদ্র সমাজে যে ব্যবস্থা, তোদের জন্যও এখানে ঠিক সেই ব্যবস্থা। তোর ফাঁসি দেখে এখানকার হতভাগারা যদি একটু আনন্দ পায় তো মন্দ কি। তোকে চার মিনিট সময় দিলাম। ফাঁসিতে ঝুলবার আগে যদি ভগবানকে ডাকতে চাস্ তো ডেকে নে।"

"বাঃ বাঃ, ক্লোপিন্ ভায়া বেশ বলতে পারে।"—গ্যালিলির সম্রাট্ বলল।

নিরুপায় গ্রীঁগোয়ারের তখন খানিকটা সাহস বেড়েছে। সে বেশ জোর দিয়ে বলল, "আপনাদের একটু ভুল হচ্ছে। আমার নাম পিয়ঁারী গ্রীঁগোয়ার। আমি একজন কবি। আজ দুপুরে আমার লেখা নাটকেরই অভিনয় হয়েছিল।"

"ও বাছাধন, তুই! আমিও তো তখন সেখানে ছিলাম। তোর ওই অভিনয়ের জ্বালায় আমার ভিক্ষে পাওয়া শিকেয় উঠতে বসেছিল।

তবে তো সেজন্যও তোর ফাঁসি হওয়া দরকার।”—ক্লোপিন্ গম্ভীর সুরে বলল।

গ্রীঁগোয়ার শেষ চেষ্টা করল। বলল, “আমি তো বুঝেই উঠতে পারছি না কবি, চোর, ভবঘুরে আর ভিখারীর মধ্যে তফাত কোথায়? মার্কুরিয়াস্ কি চোর ছিলেন না? ঈশপ কি ভবঘুরে ছিলেন না? হোমার কি ভিক্ষে করে বেড়াতেন না?”

ক্লোপিন্ বাধা দিয়ে বলল, “তোর ওই ছেঁদো কথায় ভুলাতে পারবিনে। যা, ভালো ছেলের মত ফাঁসিতে ঝুলে পড়গে।”

তখন তিনজন বিচারকের মধ্যে কি সব সলাপরামর্শ হল। তারপর ক্লোপিন্ বলল, “ফাঁসি থেকে তোর রেহাই পাবার এক উপায় আছে, যদি তুই রাজী থাকিস্। তুই আমাদের দলে যোগ দিবি?”

গ্রীঁগোয়ার যেন অকুলে কূল পেল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার এ অপূর্ব সুযোগ সে ছাড়ল না। বলল, “নিশ্চয়।”

“তুই চোর, জোচ্চোর, ভবঘুরে, বদমাশ হবি?”

“হ্যাঁ।”

“এ তোর মুখের কথা, না মনের কথা?”

“মনের কথা।”

“কিন্তু তাতেও ফাঁসি থেকে রেহাই পাবিনে। ফাঁসি তোকে যেতেই হবে। তবে এখন নয়, এখানেও নয়। সে ফাঁসি খুব ধুমধাম করে হবে। প্যারীর ভদ্রলোকেরা গাঁটের পয়সা খরচ করে তোর ফাঁসির ব্যবস্থা করবে। সেই তোর মস্ত সান্ত্বনা।”

“তা বটে।”

“তবে আমাদের দলে যোগ দেবার সুবিধেও আছে। ফুটপাতে শোবার জন্য ভাড়া লাগবে না, রাস্তার আলোর জন্য ট্যাক্স গুনতে হবে না। কোন ভিখারীকে ভিক্ষে দিতে হবে না, বরঞ্চ তুই-ই ভিক্ষে পাবি।”

“সে তো খুবই ভালো কথা।”

"তুই যে আমাদের দলে যোগ দিবি, এ তো শুধু মুখে বললে হবে না, কাজেও দেখাতে হবে।"

"তাই দেখাব।"

ক্লোপিনের আদেশে দুইজন লোক তখন দুটি মোটা খুঁটি ও একখানা কাঠ নিয়ে এল। কাঠখানাকে মাথায় আড়াআড়ি বেঁধে খুঁটি দুটি দাঁড় করিয়ে দিল। সেই কাঠখানা থেকে একটা দড়ির ফাঁস ঝুলছে।

গ্রীঁগোয়ার প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারল না। এও যে ফাঁসিরই ব্যবস্থা! তারপর দেখল, আর একজন লোক কাপড়ে তৈরী একটা প্রকাণ্ড পুতুল হাতে করে আনছে। পুতুলটির গায় অসংখ্য ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলছে। আর একটু দোলাতেই তা থেকে টুং টুং শব্দ হচ্ছে।

পুতুলটিকে সেই আড়ায় ঝুলান হল। তার নীচে রাখা হল একটা নড়বড়ে টুল, তার একটি পা ছোট।

গ্রীঁগোয়ারের উপর আদেশ হল তাকে টুলে দাঁড়িয়ে সেই পুতুলটির পকেটে যে টাকার থলিটি আছে তা তুলে আনতে হবে। কিন্তু একটুও শব্দ হওয়া চলবে না। যদি সে সফল হয়, তবে তার যোগ্যতা প্রমাণিত হবে। তা হলে তাকে সাতদিন বেদম মার দেওয়া হবে, যাতে মার খেলে সহ্য করতে পারে।

"যদি না পারি?"

"ফাঁসি যাবি।"

"যদি বাতাসে ঘণ্টা বেজে ওঠে।"

"তা হলেও ফাঁসি। নে, এবার উঠে পড়।"

গ্রীঁগোয়ার কোন রকমে টুলে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর পুতুলে হাত দিতে গিয়ে যেই একটু কাত হয়েছে, অমনি টুলটি উলটে গেল। নিরুপায় গ্রীঁগোয়ার তখন পুতুলটিকেই জোরে আঁকড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টুং টুং করে সব কটি ঘণ্টা বেজে উঠল। আর সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ক্লোপিন্ হুকুম করল, "শয়তানটাকে টেনে তোল্। তারপর ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দে।"

তাকে টেনে তুলতে হল না। সে নিজেই উঠে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে পুতুলটিকে সরিয়ে সেখানে একটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

আবার তাকে টুলের উপর উঠতে হল। তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরান হল। এবার শুধু একটা ধাক্কা দিয়ে টুলটা সরিয়ে দিলেই হয়।

ক্লোপিন্ বলল, "আমার হাততালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন টুলটি সরিয়ে নিবি, একজন তার পা দুটি ধরে ঝুলে পড়বি, আর একজন তার কাঁধে চেপে বসবি। তিনটি কাজই যেন এক সাথে হয়।"

এই আদেশ শুনে গ্রীঁগোয়ারের মুখ শুকিয়ে গেল। বাঁচবার আর কোন আশাই রইল না।

ক্লোপিন্ জিজ্ঞাসা করল, "তোরা তিনজনেই তৈরী?"

তারপর হাততালি দিতে গিয়েও থেমে গেল। বলল, "একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মেয়েদের জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কেউ তোকে বিয়ে করতে রাজী কিনা। যদি কেউ তোকে বিয়ে করে, তবে আর তোর ফাঁসি হবে না। এই আমাদের নিয়ম।"

কিন্তু কোন মেয়েই তাকে বিয়ে করতে রাজী হল না। গ্রীঁগোয়ারের শেষ আশাটুকুও গেল। চোখ বুজে সে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ক্লোপিন্ হাততালি দিতে যাচ্ছে, এমন সময় কে একজন চিৎকার করে উঠল—"এস্‌মেরেলদা! এস্‌মেরেলদা আসছে।"

সবাই তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। গ্রীঁগোয়ার দেখল, সেই অপরূপ সুন্দরী বেদের মেয়েটি। সঙ্গে তার সেই ছাগলটিও আছে।

এস্‌মেরেলদা ধীর পদে গ্রীঁগোয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ক্লোপিন্‌কে বলল, "তোমরা তাকে তা হলে ফাঁসিতেই ঝুলাবে?"

"হ্যাঁ। তবে তুমি যদি ওকে বিয়ে কর, তবে সে বেঁচে যায়।"

"তবে আমি তাকে বিয়েই করব।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

গ্রীঁগোয়ারের মনে হল, সে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে।

তার গলার ফাঁস খুলে যখন তাকে মাটিতে নামান হল, তখন সে বুঝতে পারল, সে জেগেই আছে।

মিশরের ডিউক তখন নিঃশব্দে একটি মাটির কলসী এস্‌মেরেলদার হাতে তুলে দিল। এস্‌মেরেলদা আবার তা গ্রীঁগোয়ারের হাতে দিল বলল, "এক আছাড়ে এটা ভেঙে ফেলো।"

গ্রীঁগোয়ার আছাড় দিতেই ওটা চার টুকরা হয়ে গেল।

মিশরের ডিউক তখন তাদের দুজনের মাথায় হাত রেখে বলল, "তোমাদের বিয়ে হল। আজ থেকে চার বছর তোমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন যেখানে খুশী যেতে পার।"

॥ ১২ ॥

এস্‌মেরেলদা গ্রীঁগোয়ারকে তার ঘরে নিয়ে এল। ঘরটি ছোট, দরজা জানালা বেশ ভাল করে আঁটা। তাই ভিতরটি বেশ গরম। এক পাশে একটি ছোট টেবিল। এখনই হয়ত তার উপর রাতের খাবার সাজান হবে।

গ্রীঁগোয়ার টেবিলটির পাশেই বসল। তার মনে তখন নানা রঙের স্বপ্ন। সে যেন রূপকথার রাজপুত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসেছে। রাজকন্যাকে নিয়ে এখনই আবার ঘোড়ায় চড়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যাবে।

তখনই তার দৃষ্টি তার ছেঁড়া জামা কাপড়ের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেল।

আজ তাদের মধু-যামিনী। দুজনের মনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষার উদয় হবার কথা। কিন্তু এস্‌মেরেলদা যেন পাথরের পুতুল! তার সম্বন্ধে সে একেবারে নির্বিকার। গ্রীঁগোয়ার বলে যে কেউ সে ঘরে আছে, এ যেন তার নজরেই পড়ছিল না।

গ্রীঁগোয়ার বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে এস্‌মেরেলদাকে দেখতে লাগল। আজ দুপুরেও যে ছিল শুধু মাত্র পথের নর্তকী, সেই আজ সন্ধ্যায় হয়েছে তার জীবন-দাত্রী, তার জীবনে দেবতার আশীর্বাদ। সেই অপূর্ব নারী তাকে বিয়ে করেছে, তার হৃদয়ের সমস্ত সুধায় সে তাকে অভিষিক্ত করবে, এত সুখ সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। অথচ সে সত্যই তার স্বামী, এস্‌মেরেলদা তার স্ত্রী।

মনের এই বিহ্বল ভাব নিয়ে সে যেই এস্‌মেরেলদাকে একটু আদর করতে গেল, অমনি সে চকিত হরিণীর মত দূরে সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মতলব কি, বল তো!"

তার এই প্রশ্নে গ্রীঁগোয়ার মনে মনে আহত হল। বলল, "আমি কি চাই, তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে?"

"সত্যি, আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।"

এস্‌মেরেলদার প্রতি অনুরাগে উন্মত্ত গ্রীঁগোয়ার ক্ষুব্ধচিত্তে বলল, "এ আবার কেমন কথা? আমি কি তোমার স্বামী নই?"

এই বলে সে দুই বাহু দিয়ে আবার এস্‌মেরেলদাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। এস্‌মেরেলদা মুহূর্তে ঘরের আর এক কোণে সরে গিয়ে গ্রীঁগোয়ারের অলক্ষ্যে একটি ছোরা হাতে নিল। তখন তার চোখে যেন আগুন জ্বলছে, মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। তার ছাগলটিও শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। কুসুম-সুকোমল এস্‌মেরেলদা তখন মৌমাছির মত ভীষণ।

তার হাতে ছোরা দেখে গ্রীঁগোয়ার আবার জিজ্ঞাসা করল, "এই যদি তোমার মনের ভাব, তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন?"

"তোমাকে ফাঁসি থেকে বাঁচাবার জন্য।" এস্‌মেরেলদার এই নিরুত্তাপ উত্তর শুনে গ্রীঁগোয়ারের সুখস্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল। সে

করুণ কণ্ঠে বলল, "শুধু আমাকে বাঁচাবার জন্য? তার বেশী কিছু নয়?"

"তার বেশী আবার কি থাকবে?"

"তবে সেই কলসী ভাঙার ছলনার কি দরকার ছিল?"

এস্‌মেরেলদা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ছোরা হাতে সে চুপ করে রইল। ছাগলটিও রণমূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

গ্রীঁগোয়ার তখন বলল, "এসো, সন্ধি করা যাক্‌। তোমার ছোরা রেখে দাও। জানো তো ওরকম ছোরাহাতে ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হবে। আমি শপথ করে বলছি, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কোনদিন তোমার ত্রিসীমানায় যাব না। যাক এবার কিছু খেতে দেবে তো?"

এস্‌মেরেলদা এ কথারও কোন জবাব দিল না। শুধু একটু হাসল। তারপর ছোরাটি লুকিয়ে রেখে গ্রীঁগোয়ারকে খেতে দিল—রুটি, মাংস, আপেল। আর কিছু পানীয়।

গ্রীঁগোয়ার সারাদিন অভুক্ত। সামনে খাবার দেখে তার আর তর সইল না। সে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

এস্‌মেরেলদা চুপ করে বসে তার খাওয়া দেখছিল। কিন্তু তার মন তখন অন্য রাজ্যে। মাঝে মাঝে তার মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠছে, মাঝে মাঝে সে তার জালিকে আদর করছে। ঘরের মধ্যে একটি মোমবাতি মৃদু আলোকশিখা ছড়াচ্ছে।

খেতে খেতে গ্রীঁগোয়ারের প্রচণ্ড খিদে যখন নিবৃত্ত হল, তখন সে দেখল টেবিলে একটা শুকনো আপেল ছাড়া আর কিছুই নেই। সবই তার উদরে চলে গেছে।

সে তখন লজ্জিত কণ্ঠে বলল, "এস্‌মেরেলদা, তোমার তো কিছু খাওয়া হল না।"

গ্রীঁগোয়ারের একথা এস্‌মেরেলদার কানে প্রবেশ করল না। সে তখনও অন্যমনস্ক, তার নিভৃত চিন্তায় তন্ময়।

সে আবার জোরে ডাকল, "এস্‌মেরেলদা!"

এ আহ্বানেরও কোন উত্তর মিলল না।

এ সময় জালি তার কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করতে তার চৈতন্য হল। বলল, "কি চাও, জালি ?"

গ্রীঁগোয়ার উত্তর দিল, "বেচারার বোধ হয় খিদে পেয়েছে।"

এস্‌মেরেলদা তাকে এক টুকরো রুটি ভেঙে দিল।

গ্রীঁগোয়ার আবার তার পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল।

"তুমি তাহলে আমায় স্বামী বলে মানতে রাজী নও ?"

"না"—সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"প্রেমিক হিসাবে ?"

"তাও না।"

"বন্ধু হিসাবে ?"

"ভেবে দেখি।"

"বন্ধুত্ব কাকে বলে জানো ?"

"জানি। সে যেন ভাইবোনের ভালবাসা। মনের বিনিময় হয় না, তবু যেন এক মন। যেন একই হাতের ছুটি আঙুল। এক সাথেই আছে, তবুও আলাদা।"

"আর প্রেম ?"

প্রেম! এস্‌মেরেলদার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল। তার চোখে যেন বিহ্যুৎ খেলে গেল। বলল "প্রেম! সে হচ্ছে ছুটি হৃদয়ের নিবিড় মিলন। একজন পুরুষ আর একজন নারী মিলে স্বর্গ-সৃষ্টি।"

"সে কেমন পুরুষ ?"

"সে হবে পৌরুষের প্রতিমূর্তি। তার মাথায় থাকবে শিরস্ত্রাণ, হাতে থাকবে তরবারি। সে হবে অশ্বারোহী।"

"মনে হচ্ছে, তুমি কাউকে ভালবাস !"

এস্‌মেরেলদা তার স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বলল, "কিছুদিন না গেলে বলতে পারব না।"

"আজ, এখনই পারবে না ?"

এস্‌মেরেলদা এ প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝল। তার দৃষ্টি আবার কঠিন হয়ে উঠল। নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিল, "বিপদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করবার শক্তি যার নেই, তাকে আমি কোনদিনই ভালবাসতে পারব না।"

গ্রীঁগোয়ারের মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। কোয়াসিমোদোর হাত থেকে যে আজ সে তাকে রক্ষা করতে পারেনি, এ তারই ইঙ্গিত।

সে জিজ্ঞাসা করল "কোয়াসিমোদোর হাত থেকে কি করে শেষ অবধি রেহাই পেলে।"

"ও সেই কুঁজোটার কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ, কি করে রক্ষা পেলে ?"

এস্‌মেরেলদা এবারও কোন জবাব দিল না।

"কোয়াসিমোদো তোমায় কোথায় নিতে চাচ্ছিল ?"

"জানি না। তুমিও তো আমার পিছু নিয়েছিলে। কি মতলবে ?"

"সত্যি বলতে কি আমি নিজেও তা জানি নে।"

॥ ১৩ ॥

এর পর দুজনেই চুপ চাপ। তার পর এস্‌মেরেলদা একটি গানের কলি গুনগুন করে গাইতে লাগল, আর জালিকে আদর করতে লাগল।

গ্রীঁগোয়ারই আবার শুরু করল—"তোমার ছাগলটি ভারী সুন্দর!"

"এ আমার বোন।"

"আচ্ছা তোমার নাম এস্‌মেরেলদা কেন ?"

"জানি না।"

"তবুও ?"

এস্‌মেরেলদা তার কাঁচুলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট থলি বার করল। থলিটা গলার মালার সাথে বাঁধা। রেশমী কাপড়ে

তৈরী, মাঝে একটি কাচের পুঁতি বসান—দেখতে প্রায় পান্নার মত।

সে সেটা দেখিয়ে বলল, "বোধ হয় এজন্য।"

গ্রীঁগোয়ার সেটি হাতে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই এস্‌মেরেলদা শশব্যস্ত হয়ে বলল, "এ আমার মাদুলি। তুমি ছুঁলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, নয়ত তোমার ক্ষতি হবে।"

"এ তুমি কার কাছ থেকে পেয়েছ?"

এস্‌মেরেলদা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। শুধু মাদুলিটি আবার বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখল।

গ্রীঁগোয়ার আবার জিজ্ঞাসা করল, "এস্‌মেরেলদা কথাটার মানে কি?"

"জানি না।"

"এটা কোন্ ভাষার শব্দ?"

"বোধ হয় মিশরী ভাষা।"

"তবে তুমি ফরাসী নও?"

"জানি না।"

"তোমার মা বাবা বেঁচে আছেন তো?"

এস্‌মেরেলদা এ প্রশ্নের উত্তরে গুনগুন করে একটি গান গাইতে লাগল।—"আমার মা ছিল এক পাখি, আমার বাবাও ছিল পাখি। আমি জলের উপর ভেসে বেড়াই তরী লাগে না, নদী নালা পেরিয়ে চলি পানসি লাগে না।"

"বুঝলাম। আচ্ছা তুমি যখন এ দেশে আস তখন তোমার বয়স কত ছিল?"

"আমি তখন খুবই ছোট।"

"প্যারীতে কখন এসেছ?"

"গত বছর। আসবার সময় দেখেছিলাম, রাঙা রাঙা লিনেট পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে। তখন আগস্ট মাস। বলেছিলাম সেবার প্রচণ্ড শীত পড়বে।"

"সত্যি পড়েছিল। আমার তো হাত পা জমে যাবার মত হয়েছিল। ······দেখছি, তুমি জ্যোতিষও জান।"

"না, সে বিত্তে আমার জানা নেই।

"যাকে তোমরা মিশরের ডিউক বল, সেই বুঝি তোমাদের কর্তা?"

"হ্যাঁ।"

"সেই তো আমাদের বিয়ে দিল!"

এস্‌মেরেলদার মুখে আবার ভ্রূকুটি দেখা দিল। বলল, "সে তো বিয়ের তামাশা। আমি তো তোমার নামও জানি নে।"

"ওঃ! আমার নাম?—পিয়ঁারী গ্রীঁগোয়ার।"

"আমি এর চাইতেও একটা সুন্দর নাম জানি।"—এস্‌মেরেলদার মুখ স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"তবে রে দুষ্টু মেয়ে! আমায় খেপাতে চাইছ? হয়ত এক সময় তুমি আমায় সত্যিই তোমার সুন্দর নামে ডাকবে, আমায় ভালবাসবে। ···যাক্। তুমি যখন তোমার জীবন-কাহিনী শোনালে, তখন আমার কথাও শোন। আমার বাবা ছিল একজন চাষী। ফাঁসিতে তার মৃত্যু হয়। বিশ বছর আগে প্যারী অবরোধের সময় মাও সৈন্যদের হাতে মারা যায়। ছ'বছর বয়স থেকেই আমি অনাথ। যে যা দয়া করে খেতে দিত, তাই খেয়েই দিন কাটত। পথে শুয়ে থাকতাম, পুলিসে ধরে নিয়ে হাজতে পুরত। শীতের সময় রোদই ছিল আমার গরম জামা। এমনি দুঃখকষ্টের মধ্যে ষোল বছরে পড়লাম। তখন ইচ্ছে হল, একটা কিছু করি। কত রকম চেষ্টাই করলাম! প্রথমে সেনাদলে যোগ দিলাম, সাহসের অভাবে পালিয়ে এলাম। সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করলাম, ভগবানে বিশ্বাসের অভাবে তাতেও মন বসল না। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজে হাত দিলাম, গায়ে জোর না থাকায় তাতেও সুবিধে হল না। স্কুলমাস্টারির দিকে ঝোঁক ছিল, কিন্তু লেখাপড়া জানতাম না। তাতেও দমিনি। কিন্তু শেষে বুঝলাম, কোন কাজেরই আমার যোগ্যতা নেই। অগত্যা কবিতা লেখার দিকে মন দিলাম। যে সব অকর্মাদের আর কিছু হয় না, তারাই হয় কবি।

তার পরে এক সময় নোৎরদামের আর্চডিকন ক্ল্যঁদ ফ্রোলোর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরই দয়ায় শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া একটু আধটু শিখেছি। আজ দুপুরে যে নাটকটি এমন সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, সেটি আমারই লেখা। এ ছাড়া প্রায় দুশো' পৃষ্ঠার আর একখানা বই তো লেখা হয়ে পড়ে আছে।…আমি কয়েক রকম খেলাও জানি। জালিকে তা শিখিয়ে দেব।…আমার নাটক থেকে আমি বেশ কিছু রোজগারের আশা করছি। সে রোজগারের টাকা তোমারই হবে। মোট কথা আমার যা কিছু আছে, যা কিছু হবে, সবই তোমার। তুমি যেমনটি চাও, আমরা সে ভাবেই থাকব। —স্বামী-স্ত্রীর মত, নয়ত ভাইবোনের মত। যেমন তোমার ইচ্ছা।"

তার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার কি ফল হয়েছে, দেখবার জন্য সে এস্‌মেরেলদার মুখের দিকে চাইল। দেখল, সে তখনও মাটির দিকেই তাকিয়ে আছে। আপন মনে কি বলছে, তার একটি কথা শুধু সে শুনতে পেল। সে কথাটি ফিবাস।

হঠাৎ এস্‌মেরেলদা জিজ্ঞাসা করল, "ফিবাস কথার মানে কি?"

গ্রীঁগোয়ার তার ল্যাটিন জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে বাহাদুরি নেবার আশায় বলল, "এ একটা ল্যাটিন শব্দ। এর মানে সূর্য।"

"সূর্য?"

"হ্যাঁ। তাছাড়া এক প্রিয়দর্শন দেবতার নামও ফিবাস।"

"দেবতার নাম!"—এস্‌মেরেলদা মৃদু স্বরে বলল।

এমন সময় এস্‌মেরেলদার হাত থেকে একটা বালা খুলে পড়ল। গ্রীঁগোয়ার নীচু হয়ে তা কুড়িয়ে নিয়ে যখন এস্‌মেরেলদাকে দিতে গেল, দেখে এস্‌মেরেলদা তার ছাগল নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে এবং ভেতর থেকে হুড়কা বন্ধ করে দিচ্ছে।

গ্রীঁগোয়ার হতাশ হয়ে তার ঘরের দিকে ভাল করে নজর দিল। —রাত্রে শোবার মত কোন ব্যবস্থা আছে কিনা।

দেখল, এক কোণে কাঠের বড় একটা সিন্দুক ছাড়া আর কিছু

নেই। তার উপরটাও সমতল নয়। উঁচুনীচু নানা রকম কাজ করা। শুতে গেলেই পিঠে লাগবে।

নিরুপায় গ্রাঁগোয়ার তার উপরই শুয়ে পড়ল। আর মনে মনে আপসোস করতে লাগল—"হায়! আমার মধুযামিনী।"

॥ ১৪ ॥

আজ কোয়াসিমোদোর বিচারের দিন।

তাকে আদালতে আনা হয়েছে।

আদালতকক্ষটি তেমন বড়ও নয়, উঁচুও নয়। খিলানের উপর গাঁথা। একদিকে একটি টেবিল। তার এক পাশে প্রভোস্টের জন্য একখানা আরামকেদারা। সেখানা তখনও খালি। আর এক পাশে একখানা চেয়ার। অডিটার তার উপরে বসা। তিনিই বিচার করবেন। নীচে রেজিস্ট্রার। সামনে দর্শকবৃন্দ। দরজার পাশে প্রহরীরা দাঁড়িয়ে। কক্ষটির একটি মাত্র জানালা। তা দিয়ে শীতের ম্লান আলো ঘরে আসছে।

কোয়াসিমোদোর হাত পা লোহার শিকলে বাঁধা। তবুও প্রহরীরা সতর্ক।

কোয়াসিমোদো স্থির, অচঞ্চল। মুখে কোন কথা নেই। তার একটিমাত্র চোখ দিয়ে সে মাঝে মাঝে তার হাত-পায়ের শিকলের দিকে চাইছে।

রেজিস্ট্রার বিচারকের হাতে কোয়াসিমোদোর বিরুদ্ধে অভিযোগের কাগজপত্র তুলে দিলেন। তাতে তার নাম ধাম বয়স পেশা সবই লেখা ছিল। তিনি তা মন দিয়ে পড়ে নিলেন। তবুও আসামীকে সে সব আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে বিচারের এই নিয়ম।

পড়া শেষ করে তিনি খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে রইলেন। এটা তাঁর অভ্যাস। এবার প্রশ্ন শুরু হবে।

আসামী বধির। বিচারকও তাই। এমন বড় হয় না। কিন্তু বিচারক তো আর সে কথা জানেন না। তিনি তাঁর অভ্যাসমত বাঁধা প্রশ্ন শুরু করলেন।

"তোর নাম?"

কোয়াসিমোদো সে প্রশ্ন শুনতে পেল না। তাই কোন জবাবও দিল না।

বিচারক ধরে নিলেন, আসামী তার নাম বলেছে। তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, "তোর বয়স?"

কোয়াসিমোদোর কাছ থেকে এবারও কোন জবাব পাওয়া গেল না। বিচারক ভাবলেন, আসামী তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তাই তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, "কি কাজ করিস?"

আসামী নীরব। দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শুরু হল।

বিচারক ভাবলেন, অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই কোয়াসি-মোদোকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোর বিরুদ্ধে তিন দফা নালিশ। রাতের বেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মেয়েদের প্রতি অশোভন আচরণ, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ সম্বন্ধে তোর কি বলবার আছে, বল্।"

তারপর রেজিস্ট্রারকে বললেন; "আসামী এতক্ষণ যা যা বলেছে, সব ঠিক ঠিক লিখে নিয়েছেন তো?"

তাঁর এই কথায় দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল উঠল।

বিচারক ভাবলেন, আসামী বুঝি তাঁকে উপহাস করে কিছু বলেছে। তাই দর্শকদের এত হাসি। তিনি ভয়ানক রেগে গিয়ে আসামীকে বললেন, "তুই যেমন বেয়াড়া উত্তর দিয়েছিস, তাতে ফাঁসি হচ্ছে তার উপযুক্ত দণ্ড। জানিস তুই কার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিস?"

তাঁর এই কথায় দর্শকরা আরও বেশী করে হেসে উঠল। এমন কি রেজিস্ট্রার ও প্রহরীদের পক্ষেও হাসি চেপে রাখা কঠিন হল। শুধু কোয়াসিমোদো অবিচল, কারণ বিচারকক্ষে কি প্রহসন হচ্ছিল, সে তার কিছুই বুঝতে পারছিল না।

বিচারকের রাগ আরো এক পর্দা চড়ল। তিনি আসামীর দিকে চেয়ে বললেন, "এমনিতেই তোর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তার উপরে আবার নূতন অপরাধ করলি, আদালতকে অপমান করেছিস, বিচারককে উপহাস করেছিস। জানিস, আমি স্বয়ং প্রভোস্টের প্রতিনিধি।"

একজন বধির ব্যক্তি যখন আর একজন বধির ব্যক্তিকে কোন কিছু বলতে শুরু করে, তখন তার কথা আর থামতে চায় না। বিচারকের বাক্যস্রোত কখন বন্ধ হত, তিনিই জানেন। এমন সময় স্বয়ং প্রভোস্ট বিচারকক্ষে প্রবেশ করে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

বিচারক তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, "প্রভোস্ট মহোদয়! আমি অনুরোধ করছি, ইচ্ছাকৃত আদালত অবমাননার জন্য আসামীকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হোক্।"

এই বলে তিনি চুপ করলেন। এতক্ষণ বক্তৃতা করে তিনি খুব পরিশ্রান্ত বোধ করছিলেন, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল।

প্রভোস্টের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি এমন জোরে কোয়াসিমোদোকে ধমক দিলেন যে, তার দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ল।

তিনি বেশ রাগ করে বললেন, "এই বদমাশ, তোকে কি জন্য ধরে আনা হয়েছে?"

কোয়াসিমোদো ভাবল, প্রভোস্ট বুঝি তার নাম জিজ্ঞাসা করছেন। তাই সে এতক্ষণ পর প্রথম মুখ খুলল। কর্কশ স্বরে বলল, "কোয়াসিমোদো।"

তার এই উত্তর শুনে দর্শকদের মধ্যে আবার অট্টহাসির রোল উঠল। প্রভোস্ট ক্রোধে লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, "কি! আমাকেও ঠাট্টা!"

কোয়াসিমোদোর কর্ণে এ কথাও প্রবেশ করল না। সে ভাবল, সে কি কাজ করে, তিনি বুঝি তাই জিজ্ঞাসা করছেন। তাই উত্তর দিল, "নোৎরদান গির্জার ঘণ্টাবাদক।"

এসমেরেলদা তখনও তার হাতে একই ভাবে ধরা—

"ঘণ্টাবাদক ! তোর কুঁজটাকেই ঘণ্টা বানিয়ে, বেত মেরে মেরে তা বাজাতে বাজাতে প্যারীর রাজপথে যাতে তোকে ঘোরান হয়, তারই ব্যবস্থা করছি। বদমাশ কোথাকার !"

"আমার বয়স জিজ্ঞাসা করছেন ? এই নবেম্বরে আমি কুড়িতে পড়ব।"

প্রভোস্ট আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। বললেন, "এত আস্পর্ধা তোর, আমাকেও বার বার ঠাট্টা !"

এই বলে তিনি দণ্ডাদেশ ঘোষণা করলেন, "একে পিলোরিতে বেঁধে এক ঘণ্টা চাবুক মারবে। আর এ আদেশের কথা শহরে জানিয়ে দিতে হবে।"

রেজিস্ট্রার সেই দণ্ডাদেশ লিখে নিলেন।

দর্শকদের মধ্যে কে যেন বলল, "বলিহারি সুবিচার !"

প্রভোস্টের কানে সে কথা যেতেই তিনি বললেন, "শয়তানটা আবার আমার বিচার নিয়ে আমাকে গালি দিচ্ছে। এই অপরাধে তার আরও বারো টাকা জরিমানা হল। টাকাটা আদায় হলে তার অর্ধেক গির্জার তহবিলে যাবে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই সংক্ষিপ্ত দণ্ডাদেশ লিখে রেজিস্ট্রার তা প্রভোস্টের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি তাতে সীলমোহর করে আদালত থেকে চলে গেলেন।

সই করার আগে বিচারক এই আদেশ একবার পড়তে লাগলেন। হতভাগ্য আসামীর প্রতি রেজিস্ট্রারের মনে কিছুটা করুণার সঞ্চার হয়েছিল। তাই তার দণ্ড যদি কিছুটা কমানো যায়, এই সাধু সংকল্প নিয়ে তিনি বিচারকের কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, "আসামী কানে শুনতে পায় না।"

বিচারক কি শুনলেন, তিনিই জানেন। কিন্তু তিনি যেন শুনেছেন এমন একটা ভাব দেখিয়ে বললেন, "এ তো মারাত্মক কথা। তবে তো আরও বেশী শাস্তি দেওয়া দরকার। তাই আমি আদেশ দিচ্ছি, বেত মারা শেষ হলে আসামী আরও এক ঘণ্টা পিলোরিতে থাকবে।"

এই কথাটি যোগ করে তিনি দণ্ডাদেশের নীচে তাঁর নাম সই করে দিলেন।

কোয়াসিমোদোর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে আগের মতই নীরব হয়ে রইল।

॥ ১৫ ॥

একজন অপরাধীকে পিলোরিতে বেঁধে চাবুক মারা হবে, এ ঘোষণা শুনে দলে দলে লোক এসে সেখানে হাজির হল। ভিড় এত বেশী হল যে প্রহরীদের পক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করাই কঠিন হয়ে উঠল। তারা তখন বাধ্য হয়ে চাবুক চালাতে লাগল।

অপরাধীকে পিলোরিতে বেঁধে সকলের সামনে শাস্তি দেওয়া তখনকার দিনের রীতি ছিল। প্যারীর জায়গায় জায়গায় অনেক স্থায়ী পিলোরি ছিল। সব পিলোরি অবশ্য একরকম ছিল না।

কোয়াসিমোদোকে যে পিলোরিতে আনা হল, সেটা অনেকটা পাথরের তৈরী চৌবাচ্চার মত। তার উপর তক্তা পেতে মঞ্চ করা। চৌবাচ্চার ভিতরে একটা খাড়া দণ্ডের সাথে তক্তাটি এমন ভাবে বাঁধা যে একটি চাকা ঘুরালে দণ্ডটি এবং তার সাথে সাথে উপরের মঞ্চটিও বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। মঞ্চে উঠবার জন্য পাকা সিঁড়ি আছে।

অপরাধী মঞ্চে উঠে হাঁটু ভেঙে বসত। সে অবস্থায় তার হাত দু'খানি পিছন দিকে বেঁধে দেওয়া হত। তার পর তাকে এমনভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা হত, যাতে সে আর নড়াচড়া করতে না পারে। জল্লাদ তখন একটি চাবুক হাতে তার পাশে দাঁড়াত, এবং তার পায়ের ধাক্কায় মঞ্চটি ঘুরতে শুরু করত। ফলে চারদিক থেকেই অপরাধীর মুখ এবং চাবুক খেতে খেতে সে মুখের কেমন চেহারা হয়, তা দেখা যেত। আর অপরাধীর পিঠ যেই জল্লাদের সামনে পড়ত, অমনি সে কষে চাবুক লাগাত।

প্রহরীরা একটা গাড়ি করে কোয়াসিমোদোকে নিয়ে এল। তাকে গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে নামান হল, টেনে হিঁচড়ে মঞ্চে তোলা হল, সেখানে তাকে হাঁটু গেড়ে বসান হল, কটি পর্যন্ত তার সমস্ত পরিচ্ছদ খুলে তার পিঠটাকে উন্মুক্ত করা হল, তার পর তাকে আবার নূতন করে পিলোরির সাথে বাঁধা হল।

সে কোন রকম বাধা দিল না, কোন আপত্তি করল না। শান্ত নির্বিকার ভাবে সব সহ্য করল। সবাই জানত সে বধির, কিন্তু তার এই অচঞ্চল ভাব দেখে কারও কারও মনে হল, সে কি কিছু দেখতে পাচ্ছে না? সে কি তবে অন্ধ?

কোয়াসিমোদোর পিঠ অনাবৃত হতেই তার কুঁজটি সকলের চোখে পড়ল। অমনি সবার ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ হল। একজন সরকারী কর্মচারী সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল, কোয়াসিমোদোর অপরাধ কি, তার উপর কি দণ্ডাদেশ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সরকারী তকমা-আঁটা একজন বেঁটে বলিষ্ঠ ব্যক্তি মঞ্চে উঠে কোয়াসিমোদোর পাশে দাঁড়াল। তার হাতে একটি লম্বা চাবুক। চাবুকের ফিতেগুলি চামড়ার। ফিতেগুলির মাঝে মাঝে গিঁট বাঁধা। আর সেই গিঁটের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ছুঁচ বসানো। সে তার হাতের আস্তিন গুটিয়ে চাবুকটিকে মাথার উপর তুলে ধরল, তার পর পা দিয়ে মঞ্চটিকে একটা ধাক্কা মারল।

দর্শকদের মধ্যে জেঁহাও একজন। সে চিৎকার করে বলল, "সবাই দেখুন, আমার দাদা আর্চডিকনের প্রিয় ঘণ্টাবাদক কোয়াসিমোদোকে এখনই চাবুক মারা শুরু হবে। ব্যাটা যেন পূর্বদেশের একটি ভাস্কর্য, তার কুঁজটি যেন গম্বুজ, আর পা দুটি যেন লতানো থাম।"

তার কথা শুনে জনতা হো হো করে হেসে উঠল।

জল্লাদের পায়ের ধাক্কায় মঞ্চটি বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে কোয়াসিমোদোও হেলে দুলে ঘুরতে লাগল। জল্লাদের চাবুক তার পিঠে পড়তে লাগল—সপাং সপাং।

এতক্ষণ কোয়াসিমোদো যেন ঘুমের ঘোরে ছিল, চাবুক পিঠে পড়তেই সে ঘোর কেটে গেল। ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারল। সে তখন বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগেও সে চেষ্টা সফল হল না।

চাবুকের সাথে সাথে তার মুখের পেশী কুঞ্চিত হতে লাগল, কিন্তু সে মুখ থেকে কোন কাতরোক্তি বের হল না। শুধু তার মাথাটি একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, একবার সামনে, একবার পেছনে আন্দোলিত হতে লাগল।

চাবুকের পর চাবুক পড়তে লাগল। তার পিঠ ও কাঁধ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে রক্তে চাবুকের ফিতাগুলি লাল হয়ে উঠল। ফিতা থেকে ছিটকে ছিটকে বিন্দু বিন্দু রক্ত দর্শকদের গায়েও পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ চাবুক খাবার পরই সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তার মুখে বিষাদের ছায়া নামল। সে তখন তার একটি মাত্র চোখ বুজে মাথাটি বুকের উপর রেখে এমন ভাবে রইল যেন তার দেহে প্রাণ নেই।

এদিকে চাবুকের পর চাবুক পড়ছে, জল্লাদ নিষ্ঠুর উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠছে, হৃদয়হীন জনতা সে দৃশ্য উদ্দাম আনন্দে উপভোগ করছে।

সময় গণনার জন্য চাবুক মারা শুরু করার আগেই মঞ্চের এক পাশে একটি বালুকাঘড়ি রেখে দেওয়া হয়েছিল। যখন দেখা গেল, এক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন চাবুক মারা বন্ধ হল, মঞ্চের গতি স্থির হল, এবং কোয়াসিমোদো ধীরে ধীরে তার চোখ খুলল।

দু'জন সহকারী তখন তার ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে তার উপর একটা মলম লাগিয়ে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল। একখণ্ড হলদে রঙের কাপড় দিয়ে তার কুঁজটি ঢেকে দেওয়া হল।

তখনও তার শাস্তির শেষ হয়নি। এর পরও তাকে এক ঘণ্টা পিলোরির উপর পড়ে থাকতে হবে।

কাজেই বালুকাঘড়িটি আবার ঠিক করা হল। কোয়াসিমোদোকে আবার মঞ্চের সাথে বাঁধা হল।

তার এই দুর্দশায় দর্শকদের চিত্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। তারা তাকে নানাভাবে বিদ্রূপ করতে লাগল। এ ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের উৎসাহই বেশী। কেউ কেউ তাকে ঢিল পর্যন্ত ছুড়তে লাগল।

কোয়াসিমোদোর বধির কর্ণে কোন শব্দ প্রবেশ না করলেও, সে সবই দেখতে লাগল।

গোড়ার দিকে সব অত্যাচারই সে নীরবে সহ্য করল। শেষে সে ধৈর্য হারাল। কিন্তু তার হাত পা বাঁধা, নড়বার ক্ষমতা নেই। তাই তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিকে কেউ ভয় পেল না। রুদ্ধ আক্রোশে সে আর একবার তার বন্ধনপাশ ছিন্ন করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হল না। শুধু মঞ্চের উপরের কাঠের তক্তাখানি মড়মড় করে উঠল। তার এই ব্যর্থতায় দর্শকরা আবার তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের লজ্জা কোয়াসিমোদোকে স্পর্শও করতে পারল না। মনুষ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তার বন্য প্রকৃতিতে লজ্জার কোন বালাই ছিল না। শুধু তার মন এক এক সময় বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত, আবার পর মুহূর্তেই হতাশায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল।

এমন সময় একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে একজন ধর্মযাজক এদিকেই আসছেন, দেখা গেল। তাঁকে দেখে কোয়াসিমোদোর হিংস্র দৃষ্টি কোমল, বিষণ্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ধর্মযাজক আর্চডিকন্ ক্লঁদ ফ্রোলো। তাঁকে দেখে কোয়াসিমোদোর মনে হল, তিনি যেন মুক্তির দূত হয়ে সেখানে এসেছেন। কিন্তু এ তার ভুল আশা। ক্লঁদ ফ্রোলো একপলক তাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন।

এ দেখে কোয়াসিমোদোর আশার আলো নিভে গেল, তার মুখে মেঘের ছায়া গাঢ়তর হল।

সময় বয়ে যেতে লাগল। কোয়াসিমোদো শুষ্ক কণ্ঠে জলের জন্য আকুলিবিকুলি করতে লাগল। শেষে সে তার স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—"একটু জল।"

তার এই কাতর আর্তনাদে দর্শকদের মনে দয়া হওয়া দূরে থাক্ তারা আরও কৌতুক বোধ করতে লাগল।

আবার সে কাতর দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইল। আবার চিৎকার করে উঠল—"একটু জল।"

কারও কোন দয়া হল না। একজন স্ত্রীলোক তার দিকে একটা পাথরের টুকরা ছুড়ে দিয়ে বলল, "এই নে, এই খেয়ে তেষ্টা মেটা। রাত-দুপুরে ঘণ্টা বাজিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গাতিস্ এবার তার ফল ভোগ কর।"

কোয়াসিমোদো আবার চিৎকার করে উঠল—"একটু জল।"

তার এই চিৎকার কানে যেতেই একটি তরুণী এদিকে এগিয়ে এল। জনতা ব্যস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। তার হাতে একটি তাম্বুরিন, সাথে একটি ছাগল।

তাকে দেখে কোয়াসিমোদোর অন্তর বিদ্বেষে ভরে গেল। একেই সে গত রাত্রিতে হরণ করতে গিয়ে বিফল হয়েছে। এরই জন্য আজ তার এই শাস্তি। …সেও হয় তো আর সকলের মতই তার ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

তরুণী পিলোরির সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে এল। কোয়াসিমোদো মনে মনে গর্জন করতে লাগল। যদি তার হাত পা বাঁধা না থাকত, তবে পিলোরির সিঁড়িতেই হয়তো তার মাথা গুঁড়া করে দিত।

তরুণী নিঃশব্দে কোয়াসিমোদোর কাছে গেল। তার মুখে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চিহ্ন নেই, তার চোখে শুধু করুণা, শুধু মমতা।

সে তার কোমর থেকে জলের বোতলটি খুলে কোয়াসিমোদোর দিকে এগিয়ে দিল। এই করুণার স্পর্শে কোয়াসিমোদোর শুষ্ক চক্ষু সজল হয়ে উঠল। বিন্দু বিন্দু করে সে অশ্রু ঝরতে লাগল। জীবনে বোধ হয় এই তার প্রথম অশ্রুপাত!

আবেগ-বিহ্বল কোয়াসিমোদো তৃষ্ণা ভুলে এই দয়াময়ীর দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইল। তরুণী তখন বোতলের মুখটি কোয়া-সিমোদোর মুখে তুলে দিল। মরুভূমির তৃষ্ণা বুকে নিয়ে সে এক নিঃশ্বাসে সবটক জল পান করে বোতলটি একেবারে নিঃশেষ করল।

তার কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সে তরুণীর দিকে হাত বাড়াতেই তরুণী সভয়ে পিছিয়ে গেল। গত রাত্রির বিভীষিকা সে এখনও ভুলতে পারেনি।

কোয়াসিমোদো করুণ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইল। জনতা এই করুণাময়ীর কল্যাণমূর্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইল।

ঠিক সেই মুহূর্তে টু-রোঁলার সেই নারী জানালা দিয়ে তরুণীকে দেখতে পেল। আর অমনি তার অভিশাপ শুরু হল—"মিশরের ডাইনী, তোর মাথায় বাজ পড়ুক।"

তরুণীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। কম্পিত পদে সে পিলোরি থেকে নেমে এল। তা দেখে সেই নারী আবার বলতে লাগল—"আজ নেমে এলি, কিন্তু তোকেও একদিন ওখানে উঠতে হবে।"

কোয়াসিমোদোর শাস্তির মেয়াদ ফুরাল। তাকে ধরাধরি করে পিলোরি থেকে নামিয়ে দেওয়া হল।

জনতাও আর দেরি না করে একে একে চলে গেল।

॥ ১৬ ॥

এই ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। নোৎরদাম গির্জার বিপরীত দিকের একটি বড় বাড়িতে লোকের আনাগোনা চলছে। মনে হয় সেখানে কোন উৎসব চলছে।

তখন বেলা শেষ। দিনান্তের স্বর্ণালোক নোৎরদাম গির্জার উপরে পড়ে তাকে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত করছে। প্রাসাদের বারান্দায় বসে কয়েকটি তরুণী হাসিগল্পের সাথে সাথে সেই অপরূপ সুষমা উপভোগ করছে।

ঘরের ভিতরেও কয়েকটি সুবেশা তরুণী। তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে সেলাই।

একপাশে ক্যাপটেন ফিবাস্ বসা। তার পরিধানে যোদ্ধার

বেশ। সে আপন মনে হাতের দস্তানা দিয়ে তার তরবারির খাপটি পরিষ্কার করছে।

বাড়ির গিন্নী তাকে বার বার করে বুঝাচ্ছে, তার মেয়ে ফ্লুঁ্যর দ্য লিজের মত এমন গুণের মেয়ে বিরল। তাকে বিয়ে করা ক্যাপটেনের মহা ভাগ্যের কথা। ক্যাপটেনের অন্যমনস্ক কানে সব কথা প্রবেশ করছিল না।

ফিবাসের সাথে ফ্লুঁ্যর দ্য লিজের বিয়ের কথা কিছুদিন আগেই পাকাপাকি হয়ে গেছে। তাই ক্যাপটেন মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে, তার ভাবী বধূর সাথে খানিকক্ষণ কাটিয়ে যায়।

সেদিনও তেমনি এসেছিল। এ উপলক্ষে গিন্নী তার আরও কয়েকজন বান্ধবী ও তার মেয়েদের নেমন্তন্ন করেছিল।

গিন্নীর একান্ত ইচ্ছা, ফিবাস্ আর তার মেয়ে নিরিবিলিতে বসে গল্পগুজব করুক। সেটা বুঝতে পেরে ফিবাস্ তার ভাবী বধূর কাছে গিয়ে বসল, দুজনে কথাবার্তাও শুরু হল। কিন্তু ফিবাস্ এমন বোকার মত কথা বলতে লাগল যে, তাদের আলাপ মোটেই জমল না। ফিবাস্ও তা বুঝতে পেরে ভারী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

এমন সময় সাত বছরের একটি মেয়ে হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই দেখ, কি সুন্দর একটা মেয়ে তাম্বুরিন বাজিয়ে কেমন চমৎকার নাচছে।"

তাম্বুরিনের মধুর শব্দ অনেকেরই কানে এসেছিল, কিন্তু কেউ তেমন লক্ষ্য করেনি। এবার মেয়েটির কথায় সবাই নর্তকীকে দেখবার জন্য বারান্দায় এসে বসল।

ফিবাস্ও তার অস্বস্তি থেকে রেহাই পেল। বাস্তবিক বিয়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, ভাবী বধূর উপর তার আকর্ষণ যেন ততই কমে আসছিল।

ফিবাস্ চিরদিনই চপলমতি। কুসঙ্গে মিশে তার এই চপলতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। সস্তা আমোদ, অসভ্য কথাবার্তা, এতেই তার আনন্দ। এই মার্জিত রুচির মধ্যে তার ভদ্রতার মুখোশ যাচ্ছে

খসে না পড়ে, সর্বক্ষণ তার সে দিকেই মন ছিল। তাই সে এমন অন্যমনস্ক।

তার ভাবী বধূ তাকে জিজ্ঞাসা করল, "মাসখানেক আগে না তুমি একটি বেদের মেয়েকে গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করেছিলে? দেখ তো এটি সেই মেয়েই কি না?"

ফিবাস্ সে দিকে লক্ষ্য করে বললে, "তাই তো মনে হচ্ছে। সাথে তার ছাগলটাও রয়েছে।"

ছোট মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, "ছাগলটার শিং দুটি কি সত্যি সত্যি সোনার?"

সে প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে আবার বলে উঠল, "দেখ দেখ, নোৎরদাম গির্জার টাওয়ার থেকে কালো পোশাক-পরা একজন লোক কেমন এক দৃষ্টিতে বেদের মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে।"

সকলেই দেখল, সত্যই টাওয়ারের উপর থেকে এক ব্যক্তি অপলক চোখে বেদের মেয়েটিকে দেখছেন। তিনি নোৎরদামেরই আর্চবিশপ ক্লঁদ ফ্রোলো।

"ছি, ছি, একজন ধর্মযাজক হয়ে একটা বেদের মেয়ের দিকে এমনি তাকিয়ে থাকা ভারী অন্যায়।"—বাড়ির গিন্নী বলল।

ফ্লুঁর দ্য লিজ আবদারের সুরে ফিবাসকে বলল, "মেয়েটিকে যখন তুমি চেনো, তখন একবার ডাক না!"

আর সবাইও সেই একই অনুরোধ করল।

"তার কি আমার কথা মনে আছে?"—এই বলে সে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে জোরে জোরে ডাকল, "এই মেয়ে, একবারটি এদিকে এসো তো!"

সেই ডাক কানে যেতেই মেয়েটি মুখ তুলে উপরের দিকে চাইল। ফিবাসকে দেখে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ তার নাচ বন্ধ করে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে এল।

তাকে দেখে ছোট মেয়েটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

কিন্তু তার রূপ দেখে তরুণীদের মুখ কালো হয়ে গেল। মনে মনে তার উপর তাদের ঈর্ষ্যা হল। একটা বেদের মেয়ের এত রূপ!—এ যেন ভারী অন্যায়।

ফিবাস্ তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে চিনতে পারছ?"

"খুব পারছি।" মেয়েটি মধুর স্বরে জবাব দিল।

"সে দিন তো পালিয়ে গিয়েছিলে। আমাকে খুব ভয় করছিল বুঝি?"

"মোটেই না।" কথাটি সে এমন আন্তরিকতার সাথে বলল, ফ্লু‍ঁর দ্য লিজের তা ভাল ল্যাগল না।

ফিবাস্ আবার জিজ্ঞাসা করল, "সেই হতচ্ছাড়া কুঁজোটার মতলব কি ছিল, জানতে?"

"না।"

"তার আস্পর্ধার কথা ভাবো। তোমার মত মেয়েকে সে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তার শাস্তিও পেয়েছে! তার পিঠের চামড়া আর আস্ত নেই।"

"বেচারা!"—পিলোরির সেই করুণ দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

"তোমার দেখছি, সবার উপরই খুব দরদ।"—ফিবাস্ একটু ঠাট্টার সুরে বলল।

একটা পথের মেয়ের সাথে ফিবাস্ এমন অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করবে, এটা কারও ভালো লাগছিল না। তার ভাবী বধূর তো নয়ই। কিন্তু এ কথা সোজাসুজি ফিবাসকে বলা চলে না। তাই মেয়েটির পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে অপ্রিয় সমালোচনা শুরু করল।

মেয়েটি এতে ক্ষুণ্ণ হল। তার মুখেও সে ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। শুধু ফিবাসের মুখের উপর দৃষ্টি রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ফিবাস্ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ওদের কথায় কান দিও না। তুমি যাই পর, তাতেই তোমায় সুন্দর দেখায়

"তুমি দেখছি মেয়েটির রূপে মজে গেছ!" ফ্লুঁ্যর দ্য লিজ বিদ্রূপ করে বলল।

"মজবার মত রূপই বটে।" ফিবাস্ ফস্ করে বলে বসল।

তার ভাবী স্বামীর মুখে অন্য মেয়ের রূপের প্রশংসা! এ কোন্ মেয়ে সহ্য করতে পারে? ফ্লুঁ্যর দ্য লিজের মুখ কালো হয়ে গেল। আর সবাইও লজ্জায় মুখ ঢাকল।

শুধু বেদের মেয়েটির মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

সে তার ছাগলটিকে পথেই রেখে এসেছিল। মনিবের খোঁজে এ সময় সেও এখানে এসে হাজির। তখন সবাই বায়না ধরল, ছাগলের খেলা দেখাতে হবে। তারা শুনেছিল, ছাগলটি জাদু জানে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "কি খেলা দেখাব?"

"যে কোন একটা জাদুর খেলা, যে কোন ভেলকিবাজি।"

"আমি ওসব জানি নে।" এই বলে সে আদর করে ছাগলটিকে কাছে ডাকল। সবাই দেখল তার গলায় একটি সুন্দর চামড়ার থলি। চমৎকার কারুকার্য-করা।

এতে কি আছে জানবার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে উঠল।

মেয়েটি উত্তরে শুধু বলল, "আমার গোপন কথা।"

"তোমার আবার গোপন কথা কি? নাও তোমার খেলা শুরু কর।" ফ্লুঁ্যর দ্য লিজ বলল।

মেয়েটি সেকথা গ্রাহ্য না করে চলে যাবার জন্য দোরের দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে ফিরে ফিরে ফিবাস্‌কে দেখতে লাগল।

ফিবাস্ তাকে বলল, "কিছু খেলা না দেখিয়ে এভাবে চলে যেয়ো না।"

এদিকে ছোট মেয়েটি ছাগলটির গলা থেকে থলিটি খুলে ফেলেছে, আর তার ভেতরকার কতগুলি কাঠের অক্ষর মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছাগলটি তার সোনালী ক্ষুর দিয়ে অক্ষরগুলি সাজাতে শুরু করল। যে শব্দটি তৈরী হল, তা 'ফিবাস্'।

এই তার গোপন কথা! এ তো তবে শুধু বেদের মেয়ে নয় এ যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী! ফিবাসের প্রেমাকাঙ্ক্ষী! —এই ভেবে ফ্লুঁ্যর দ্য লিজ মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বেদেনী তাড়াতাড়ি অক্ষরগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

ফিবাস্ এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল। তারপর সেও তার পিছু পিছু চলল।

মেয়েটি এসমেরেলদা, ছাগলটি জালি।

॥ ১৭ ॥

গির্জার টাওয়ার থেকে আর্চডিকন্ ফ্রোলো একদৃষ্টিতে এসমেরেল-দাকে দেখছিলেন। তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

এসমেরেলদা তাম্বুরিন বাজিয়ে নাচছিল। তার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল দিচ্ছিল। তার পরনে লাল ও হলুদ ডোরাকাটা অদ্ভুত পোশাক।

এতদিন এসমেরেলদা একাই নেচেছে। আজ এই প্রথম নতুন লোকটিকে দেখা গেল। সে যে কে, ক্লঁ্যদ ফ্রোলো এত দূর থেকে চিনতে পারলেন না।

লোকটি যেই হোক্ এসমেরেলদার সাথে তাকে দেখে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। গির্জার পিছনের দোর খুলে তিনি তক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন এবং নাচের জায়গায় গিয়ে হাজির হলেন।

টাওয়ার থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তিনি অবাক্ হয়ে দেখলেন, কোয়াসিমোদোও তাঁরই মত নিবিষ্ট মনে এসমেরেলদার দিকেই চেয়ে আছে। সেও এমন তন্ময় যে, তাঁকে দেখেও তার তন্ময়তা ঘুচল না।

নাচের জায়গায় গিয়ে দেখেন, এসমেরেলদা নেই। শুধু সেই অদ্ভুত পোশাক-পরা লোকটি একটি চেয়ার নিয়ে কি একটা খেলা দেখাচ্ছে। চেয়ারটির উপরে একটা বিড়াল বাঁধা।

এই লোকটি গ্রীঁগোয়ার। তাকে দেখে আর্চডিকন্ ফ্রোলো বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তুমি এখানে কি করে জুটলে? সেই বেদে মেয়েটি কোথায়?"

"ঠিক বলতে পারব না। হয়ত ওই সামনের বাড়িতে গেছে।"

সত্যিই এসমেরেলদা তখন ফ্লুঁর দ্য লিজদের বাড়ি গেছে।

"তোমার খবর কি? দু'মাস তোমার দেখা নেই। এতদিন কোথায় ছিলে? এখন কি করছ?"

"দেখতেই পাচ্ছেন। চেয়ারের খেলা দেখাচ্ছি!"

"খুব চমৎকার ব্যবসায় নেমেছ!"

"না খেয়ে তো মরতে পারি না। এতে যা হোক্, দু'মুঠোর ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"তা যেন হল। কিন্তু তুমি এই মেয়েটির সাথে জুটলে কি করে?"

"ও আমার স্ত্রী। আমি ওকে বিয়ে করেছি।"

এই উত্তর শুনে ক্লঁদ ফ্রোলো বিমূঢ় হয়ে গেলেন। বললেন, "তোমার এতই অধঃপতন হয়েছে যে, এই বেদেনীকে নিয়ে মেতে আছ? একে বিয়ে করেছ?"

"এই বিয়ে করা পর্যন্তই! একদিনের জন্যও তার কাছে ঘেঁষতে পারিনি।"

"সে আবার কি কথা? এই না বললে, তাকে বিয়ে করেছ?"

"ওকে বিয়ে করেছি, অথচ ওর সঙ্গে ঘর করিনি, দুইই সত্য। মেয়ে তো নয় একেবারে জাত কেউটে। তবে সান্ত্বনা এই যে, দুবেলা খেতে পাচ্ছি, রাতে ঘুমুবারও একটা আস্তানা জুটেছে।"

এই বলে সে তার এত দিনের ইতিহাস সবিস্তারে বলে গেল।

"এ তো বড় অদ্ভুত। এর রহস্য কি জানো?"

"না। তার গলায় একটা মাদুলি আছে। তার বিশ্বাস, যদি সে সৎভাবে শুদ্ধভাবে থাকে, তবে এরই সাহায্যে সে তার হারানো বাপ-মাকে খুঁজে পাবে। সত্যি অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে! দিনরাত নাচ-গান নিয়েই আছে। দুজন ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।"

"তারা কারা ?"

"একজন টুঁ-রোলার বুড়ী। আর একজন নাকি কোন্ এক ধর্মযাজক।" শেষের কথাটি শুনে ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর মুখ কালো হয়ে গেল। গ্রীঁগোয়ার তা লক্ষ্য করল না। আপন মনেই বলতে লাগল, "বেদেদের যে দলপতি, সে তাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসে। বেদের দলও তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। তার নিজের কোমরেও সবসময় একটা ধারালো ছোরা থাকে। এই তিনটে জোর আছে বলেই সে এমন বেপরোয়া ঘুরে বেড়াতে পারে। তাছাড়া সে কখনও কারো হাত দেখে না। কাজেই জাদুবিদ্যার অভিযোগেরও তাঁর ভয় নেই। তবে তার একটা ছাগল আছে, তাকে এমন শিক্ষা দিয়েছে যে, যা জিজ্ঞাসা করা যায়, সে তার ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারে। তার শিক্ষা দেবার শক্তিও অদ্ভুত। মাত্র দু'মাসের মধ্যে সে ছাগল-টাকে অক্ষর সাজিয়ে ফিবাস্ কথাটি লিখতে শিখিয়েছে।"

"ফিবাস্! এত কথা থাকতে এটা শেখাতে গেল কেন ?"

"জানিনে। হয়ত এ কথাটার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে। কারণ যখনই সে একা থাকে, তখনই সে মনে মনে এ কথাটি মন্ত্রের মত জপ করে।"

"তুমি ঠিক জান, এ শুধু একটি কথা মাত্র। কারও নাম নয় ?"
"কার নাম হবে ?"

"সে আমি কি জানি ?"

"আমি যতদূর জানি, বেদেরা সূর্যের উপাসনা করে। সেজন্যই বুঝি এ নামটি তার এত প্রিয়।"

"ব্যাপারটা তুমি যত সহজ ভাবতে পারছ, আমি তা পারছিনে।"

"সে যত খুশী ফিবাসের নাম করুক, আমার তাতে যায় আসে না। জালি আমায় ভালবাসে, তাতেই আমি খুশী।"

"জালি আবার কে ?"

"তার ছাগলটার নাম।"

আর্চডিকন্ গম্ভীর মুখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সত্যি বলছ, মেয়েটিকে কোনদিন স্পর্শ করনি ?"

"কাকে স্পর্শ করিনি ? ছাগলটাকে ?"

"না না, এই মেয়েটিকে।"

"আমার স্ত্রীকে ? আমি দিব্যি করে বলছি, করিনি। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এ নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন ?"

এই প্রশ্নে আর্চডিকন্ বিব্রত হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ কিশোরী মেয়ের মত রক্তিম হয়ে উঠল। খানিক হয়ত ইতস্ততঃ করলেন, তারপর বললেন, "তোমার যাতে কোন অমঙ্গল না হয়, এই আমার চিন্তা। তুমি যদি তাকে স্পর্শ কর, তবে স্বয়ং শয়তান এসে তোমার কাঁধে চেপে বসবে। তখন আর কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না। তাই তোমাকে এমন সাবধান করে দিচ্ছি।"

এই বলে তিনি দ্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হতবুদ্ধি গ্রীঁগোয়ার নীরবে দাঁড়িয়ে আর্চডিকনের এই কথাগুলি ভাবতে লাগল।

॥ ১৮ ॥

পিলোরিতে শাস্তি পাবার পর থেকেই কোয়াসিমোদোর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। যে ঘণ্টাগুলি তার এত প্রিয় ছিল যেগুলি বাজিয়ে সে এত আনন্দ পেত, তাদের উপরও তার আকর্ষণ কমে গেল। যখন তখন আর ঘণ্টাগুলি বাজাত না, মাঝরাতে ঘণ্টার শব্দে প্রতিবেশীদের আর ঘুম ভাঙ্গত না।

এভাবে কিছুদিন গেল। তারপর আবার একদিন হঠাৎ তার উৎসাহ জেগে উঠল। সেদিন সে একটার পর একটা ঘণ্টা বাজিয়েই চলল। কিন্তু যেই তার দৃষ্টি হঠাৎ অদূরে নৃত্যরতা এসমেরেলদার উপর পড়ল, অমনি সে ঘণ্টার দড়ি ছেড়ে দিয়ে তার দিকেই চেয়ে

রইল। তার তখনকার জগৎ থেকে নোৎরদাম গির্জা, তার ঘণ্টা, তার আর্চবিশপ—সবই লুপ্ত হয়ে গেল। তার সম্মুখে জেগে রইল শুধু সেই বেদের মেয়ে এসমেরেলদা, তার অপরূপ দেহবল্লরী, তার লীলায়িত নৃত্য।

॥ ১৯ ॥

নোৎরদাম গির্জার উঁচুতলায় একখানি নিভৃত কক্ষ ছিল। ক্লঁদ ফ্রোলো ছাড়া আর কারো সে কক্ষে প্রবেশাধিকার ছিল না। আগে তিনি মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন, কিন্তু ইদানীং তিনি ঘন ঘন সে ঘরে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগলেন।

ঘরটি নানা অদ্ভুত জিনিসে ঠাসা। বাজে সস্তা ধাতুকে কি করে সোনায় পরিণত করা যায়, সে সময় এক শ্রেণীর রাসায়নিক দিনরাত তাই নিয়ে মাথা ঘামাতেন। ক্লঁদ ফ্রোলোও অবসর সময়ে তাই করতেন। ঘরের এই জিনিসগুলি তাঁর সে কাজেই লাগত। তাঁর যে এ বাতিক আছে, বিশেষ বিশেষ দু'একজন ছাড়া আর কেউ সে খবর রাখত না।

সেদিন তিনি তাঁর সেই নিভৃত কক্ষে একজন ভদ্রলোকের আসবার আশায় চুপ করে বসে আছেন। দোরটি ঈষৎ ভেজানো। এমন সময় তাঁর ভাই জেঁহা সেখানে দেখা দিল।

তার পায়ের শব্দ শুনে ক্লঁদ ফ্রোলো ভাবলেন, সেই ভদ্রলোকই বুঝি এসেছেন। তাই মুখ না তুলেই বললেন, "আসুন।"

জেঁহা ভেতরে প্রবেশ করতেই তাঁর ভুল ভাঙল। ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এ সময়ে? হঠাৎ কি মনে করে?"

"আমার কিছু টাকার দরকার।"

"আবার টাকা! এত টাকা তোমার কিসে লাগে?"

"সত্যি বলব ? স্ফূর্তি করতে।"

"আর আমি তোমায় টাকা যোগাতে পারব না। পড়াশুনায় তোমার মন নেই। যার তার সাথে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও। তোমার সম্পর্কে নিত্য নূতন এত অভিযোগ পাচ্ছি, কান পাতা দায়।"

"কিন্তু কিছু টাকা না হলে যে আমার চলবেই না।"

"আমায় জ্বালিও না। তাতে কোন লাভ হবে না।"

এমন সময় দোরে আবার পদশব্দ শোনা গেল। সেই ভদ্রলোক এসেছেন।

ক্ল্ঁদ ফ্রোলো তাঁর ভাইকে তাড়াতাড়ি এককোণে লুকিয়ে থাকতে বললেন।

"তাহলে আমায় কিছু টাকা দেবে তো ?"

ক্ল্ঁদ ফ্রোলো নিরুপায় হয়ে বললেন, "দেব। তবে এখন তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়। দেখো যেন টুঁ শব্দটি না হয়।"

ক্ল্ঁদ ফ্রোলো দোরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সরকারী এটর্নি। কালো পোশাকে তাঁর সারা শরীর ঢাকা। তিনি যে এখানে আসেন, কেন আসেন, তা যাতে বাইরের কেউ না জানতে পারে, তাই এই সতর্কতা।

আর্চডিকন্ ও এটর্নির মধ্যে মৃদুস্বরে কথাবার্তা শুরু হল। তার দু'একটা কথা জেঁহার কানে যেতেই সে বুঝতে পারল, সস্তা ধাতুকে কি করে সোনা করা যায়, তাই নিয়েই তাঁদের আলোচনা।

আলোচনার মধ্যে এটর্নি ভদ্রলোক ক্ল্ঁদ ফ্রোলোকে বললেন, "আপনি যে আমায় বেদের মেয়েটার কথা বলেছিলেন, আমি তা বেমালুম ভুলে বসে আছি। যাক্, সরকারী আদেশ অমান্য করে সে যখন যেখানে সেখানে নেচে বেড়ায়, ছাগল দিয়ে জাদুর খেলা দেখায়, তখন তার শাস্তির ব্যবস্থা করা শক্ত হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শীঘ্রই আমি তার ব্যবস্থা করছি। সেটা কবে করব, তাই শুধু বলে দিন।"

এই কথার উত্তরে আর্চডিকন্ বিব্রত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "সে

আমি আপনাকে পরে বলব। এ নিয়ে এখনই ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

অন্ধকারে ধুলাবালির মধ্যে কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়? তাই হাতের কাছে একটা শুকনো রুটি দেখে জেঁহা তাই চিবুতে শুরু করল।

সে শব্দে এটর্নি ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে কে?"

ক্লঁদ ফ্রোলো এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বললেন, "বোধ হয় আমার বিড়ালটা ইঁদুর ধরেছে।"

জেঁহা মনে মনে হাসল।

দুজনে আলোচনা করতে করতে একসময় কি একটা দেখবার জন্য বাইরের গ্যালারিতে গেলেন। আর সেই সুযোগে জেঁহা টেবিলের উপর থেকে ক্লঁদ ফ্রোলোর টাকার থলিটি তুলে নিয়ে চম্পট দিল।

॥ ২০ ॥

পথে নেমে জেঁহা দেখল, পথের ওপারে তার বন্ধু ফিবাস্ দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই সে জোরে জোরে ডাকতে লাগল, "এই ফিবাস্, ফিবাস্!"

জেঁহার মুখে এই ডাক শুনে ক্লঁদ ফ্রোলো চমকে উঠলেন। তিনি তখন সরকারী এটর্নিকে কি বুঝাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সে আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই জেঁহা ও ফিবাসের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন।

এটর্নি ভদ্রলোক তাঁর এই আচরণে বিস্মিত হলেন।

এদিকে জেঁহা তার বন্ধুকে বলছে, "কি ব্যাপার, এ সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে?"

"আর বল কেন? এই এতক্ষণ ন্যাকা মেয়েগুলির হাত থেকে

রেহাই পেলাম।…কি, বুঝতে পারলে না? আমার ভাবী বধূ আর তার বান্ধবীদের কথা বলছি।"

"ও তাই বল। যাক্ আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ। চল একটা হোটেলে ঢুকে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক্।"

"প্রস্তাবটা তো খুবই চমৎকার। কিন্তু টাকা কোথায়?"

"আমার কাছে আছে।"

"তোমার কাছে টাকা! হা হা হা!"

"হাসির কথা নয়। সত্যিই আছে।"

"কোথায় পেলে?"

"আরে, দাদা যার নোৎরদাম্ গির্জার আর্চবিশপ, তার আবার টাকার ভাবনা! এই দেখ।" এই বলে সে টাকার থলিটা দেখাল।

"এ যে অনেক টাকা! তবে আর ভাবনা কি? চল, একটা হোটেলে ঢুকে পড়া যাক্।"

এমন সময় এসমেরেলদার তাম্বুরিনের শব্দ শোনা গেল। সে এদিকেই আসছে।

ফিবাস্ ব্যস্ত হয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালাও। আমি এখন এ মেয়েটার সামনে পড়তে চাই না।"

"কেন বল তো? তুমি একে চেন নাকি?"

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো দেখলেন, ফিবাস জেঁহার কানে কানে কি বলল।

জেঁহা জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি বলছ?"

"সত্যি, ভগবানের নাম করে বলছি। আজই রাত সাতটায়"—

"তুমি বিশ্বাস করো, সাতটায় সে সত্যিই থাকবে?"

"নিশ্চয়!"

"তুমি সত্যি ভাগ্যবান্!"

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো সবই শুনতে পেলেন। রাগে তাঁর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি টলতে টলতে পথে নামলেন।

দুই বন্ধু একটা হোটেলে ঢুকল। ক্ল্যঁদ ফ্রোলো সে হোটেলের সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সারা শরীর একটা কালো পোশাকে ঢাকা।

জেঁহার এতখানি অধঃপতন হয়েছে! আর এই ফিবাস্!—গ্রীঁগোয়ার যার কথা বলেছিল, এসমেরেলদা যার নাম মন্ত্রের মত জপ করে!

ক্ল্যঁদ ফ্রোলো কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। অথচ তিনি স্থির থাকতে পারছিলেন না।

এদিকে দুই বন্ধু হোটেল থেকে বেরুল। ফিবাস্ বলল, "বন্ধু, তুমি আজ বড্ড বেশী মদ খেয়েছো। সোজা হয়ে হাঁটতেও পারছ না।……যাক্ এবার আমায় গোটাকয়েক টাকা দাও দেখি।"

"আর টাকা কোথায় পাব? সবই তো উড়িয়েছি।"

"তবে জাহান্নামে যাও।" এই বলে ফিবাস্ তাকে জোরে এক ধাক্কা দিতেই জেঁহা অচৈতন্য হয়ে পথের উপর লুটিয়ে পড়ল। ফিবাস্ ফিরেও তাকাল না।

ক্ল্যঁদ ফ্রোলো ভাইয়ের এ অবস্থা দেখেও দাঁড়ালেন না। তিনিও ফিবাসের পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

কিছুদূর গিয়েই ফিবাস্ বুঝতে পারল, কেউ তাকে অনুসরণ করছে। ফিবাস্ সাহসী। কিন্তু তার মনেও একটু ভয় হল!

সে সময় একটা প্রবল জনরব চলতি ছিল যে, একজন সন্ন্যাসীর ছায়ামূর্তি গভীর নিশীথে প্যারীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

সে খানিকক্ষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সেই মূর্তির কাছে গিয়ে বলল, "তুমি যদি চোর হও, চুরি করবার যদি মতলব থাকে, তবে সে আশায় গুড়ে বালি। আমার পকেট একেবারে ফুটো।"

এই কথা শুনে ছায়ামূর্তি তার কালো পোশাকের ভেতর থেকে একখানা হাত বের করে ফিবাসের হাত চেপে ধরল। বলল, "ক্যাপটেন ফিবাস্।"

ফিবাস তার নাম শুনে আশ্চর্য হল। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "তুমি আমার নামও জানো দেখছি।"

"শুধু তোমার নামই নয়, আমি এও জানি আজ রাত সাতটায় তুমি একটি মেয়ের কাছে যাবে। মেয়েটির নাম—"

ছায়ামূর্তি নামটি বলবার আগেই ফিবাসের মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে গেল, "এসমেরেলদা।"

"মিথ্যা কথা।"

"সাবধান হয়ে কথা বলবে। মিথ্যে বলা আমার অভ্যাস নেই।"

"তুমি মিথ্যে কথাই বলছ।"

ফিবাস্ ক্রোধে তার তরবারি বের করল। বলল, "তোমার এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি নাও।"

ছায়ামূর্তির মধ্যে কোন ভয়-বিহ্বলতা দেখা গেল না। স্থির অচঞ্চল স্বরে বলল, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"ধন্যবাদ।" তারপর একটু সংকোচের সাথে বলল, "আমায় গোটাকয়েক টাকা ধার দিতে পার?"

"এই নাও। কিন্তু এক শর্তে। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, আমার কথা মিথ্যে, তোমার কথাই সত্যি।"

"বেশ, তবে আমার সাথে চলো। আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখাব।"

॥ ২১ ॥

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে একটি ছোট বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। একটি বৃদ্ধা এসে দোর খুলে দিল।

ফিবাস্ তার হাতে টাকা দিয়ে বলল, "এই নাও তোমার ঘরভাড়া। সবচেয়ে ভাল ঘরটি চাই।"

বৃদ্ধা ভাড়ার টাকা তার দেরাজে রেখে আলো হাতে পথ দেখিয়ে তাদের দোতলায় নিয়ে চলল।

বৃদ্ধার একটি নাতি মেঝেতে বসে খেলছিল। যেই দেখল বৃদ্ধা উপরে যাচ্ছে, অমনি দেরাজ থেকে টাকাকড়ি সরিয়ে নিয়ে সেখানে একটা শুকনো পাতা রেখে দিল।

বৃদ্ধা ঘর দেখিয়ে প্রদীপটি উপরে রেখেই নীচে চলে এল। ফিবাস্ পাশের ঘরটি খুলে তার সঙ্গীকে তার ভেতরে লুকিয়ে থাকতে বলল। তারপর শেকল তুলে দিয়ে সেও নীচে নেমে গেল।

ক্ল'দ ফ্রোলো সেই অন্ধকার ঘরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ। একে একে অনেক কথাই ছায়াছবির মত তাঁর মনে পড়তে লাগল। নিজের কথাও ভাবলেন, ধর্মযাজক হয়ে আজ তিনি কোথায় নেমে এসেছেন! একটা সামান্য বেদেনীর জন্য তিনি কি না করছেন!

এমন সময় ঘরে ঢুকল ফিবাস্ ও এসমেরেলদা। দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল—তারুণ্যের দুই প্রতিমূর্তি।

এসমেরেলদার মুখ আরক্তিম, নয়নে লজ্জার আভা, বুকে মৃদু স্পন্দন। সুবেশ ফিবাসকেও চমৎকার দেখাচ্ছিল।

তারা দুজনে মৃদুস্বরে কথা শুরু করল। ক্ল'দ ফ্রোলো উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন।

"তুমি আমায় ঘৃণা করছ না তো?"—এসমেরেলদার সকরুণ জিজ্ঞাসা।

"ঘৃণা! কেন?"

"এখানে তোমার কাছে এসেছি বলে।"

"পাগল।"

"জান, আজ আমি আমার একটি ব্রত ভঙ্গ করছি।...এর ফলে আর আমার মা বাবার সন্ধান পাব না...আমার কবজটির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।...কিন্তু কি করব ?...জীবনের এই শুভ লগ্নে বাপমার কথা মনে করে লাভ কি ?" এই বলে সে ফিবাসের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ফিবাস্ বলল, "আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

তরুণীর মনে আজ এই মুহূর্তে কি দ্বন্দ্ব চলছে, ফিবাস্ তা কেমন করে বুঝবে ? একদিকে ব্রতভঙ্গের ভয়, অন্য দিকে ফিবাসের আকর্ষণ! শেষ পর্যন্ত প্রেমই জয়ী হল।

"ফিবাস্, আমার ফিবাস্! আমি তোমায় ভালবাসি ?"

"তুমি আমায় ভালবাস ? সত্যি ?" এই বলে ফিবাস্ তার হাতে হাত রাখল।

এসমেরেলদা বলল, "জন্মাবধি একজন সেনাপুরুষ আমার স্বপ্ন। তার পোশাক সুন্দর, দৃষ্টি উন্নত, হাতে তরবারি। বিপদে পড়লে আমায় রক্ষা করবে। ফিবাস্, তুমি আমার সেই স্বপ্ন, তুমি আমার সেই পুরুষ! আমি তোমায় ভালবাসি। বল, তুমিও আমায় ভালবাস।"

"বাসি।"

"তবে তুমি আমায় তোমার ধর্মে দীক্ষার ব্যবস্থা কর, যাতে আমাদের বিয়ে হতে পারে।"

"বিয়ের কি দরকার ? আমাদের ভালবাসাই কি যথেষ্ট নয় ?" ফিবাস্ আবার তার গলা জড়িয়ে ধরতে গেল। এসমেরেলদা ধরা দিল না। বলল, "তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না ? বেশ তাই হবে। তবে আমায় ভালবেসো।"

ক্ল'দ ফ্রোলো অন্ধকার ঘর থেকে সবই শুনছিলেন, সবই দেখছিলেন। তাঁর বকের মধ্যে ঝড় বইতে লাগল

ফিবাস্ এবার এসমেরেলদার গলা জড়িয়ে ধরল। এবার সে আর বাধা দিল না। ফিবাসের বাহুবন্ধনের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ক্ল্যঁদ ফ্রোলোর আর সহ্য হল না। তিনি এক লাথিতে সেই অন্ধকার ঘরের ভাঙ্গা দেওয়াল ভেঙে এ ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর তখনকার দৃষ্টি ক্রূর, মুখে পিশাচের হাসি। হাতে ধারালো ছুরি।

এসমেরেলদা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল! তার মুখে কোন কথা ফুটল না। ফিবাসের নজর তাঁর উপর পড়বার আগেই ক্ল্যঁদ ফ্রোলোর হাতের ছোরা তার কাঁধে আমূল বিদ্ধ হল।

এসমেরেলদা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে দেখল, একদল সৈন্য তাকে ঘিরে আছে। আর ফিবাস্ রক্তাপ্লুত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে লুটাচ্ছে। তার কাছে একটা কালো পোশাক। সৈন্যরা ওটা কুড়িয়ে নিচ্ছে। ওদের বিশ্বাস এটা ফিবাসেরই পোশাক।

সে শুনতে পেল, সৈন্যরা বলাবলি করছে, "এই ডাইনীই ক্যাপটেন ফিবাসের কাঁধে ছুরি বসিয়েছে।"

॥ ২২ ॥

এদিকে গ্রীঁগোয়ার এবং কোর্ট অব্ মিরাকল্স্-এর সবারই মনে দারুণ উদ্বেগ। এক মাস যাবৎ এসমেরেলদার কোন খোঁজ নেই।

একদিন সন্ধ্যায় সে বের হয়েছিল। তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ। একজন বলেছিল, এসমেরেলদাকে একজন সেনাপুরুষের সাথে যেতে দেখেছে।

গ্রীঁগোয়ার সে কথা বিশ্বাস করেনি। তার স্ত্রীর স্বভাব সে ভাল করেই জানে। কিন্তু এসমেরেলদা যে কেন এভাবে নিরুদ্দেশ হল, এ রহস্যেরও কোন কিনারা করতে পারল না।

গ্রীঁগোয়ারের মনে সুখ নেই। যে স্ত্রী তাকে মোটেই আমল দিত না, তার জন্যও তার চিন্তার শেষ নেই। রাত দিন সে ঘুরে বেড়ায়, যদি এসমেরেলদার দেখা মেলে।

একদিন সে বিষণ্ন মনে প্যাঁলে দ্যাঁ জাস্টিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছে, দেখে সেখানে বহু লোকের ভিড়। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল, একজন সেনাপুরুষের হত্যার অপরাধে একজন স্ত্রীলোকের বিচার হবে। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে নাকি ডাকিনী বিদ্যারও যোগ আছে!

কৌতূহলী গ্রীঁগোয়ার ভিতরে প্রবেশ করল। তখন অপরাহ্ণ। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোতে বিচারকক্ষ ঈষৎ আলোকিত। প্রশস্ত কক্ষের জায়গায় জায়গায় জ্বলন্ত মোমবাতি।

এর মধ্যেই বিচারকক্ষটি দর্শকে ভরে গেছে। দুই দিকে সরকারী বেসরকারী উকিল, আদালতের কর্মচারী। বিচারকগণ উচ্চাসনে উপবিষ্ট।

বিচার শুরু হল।

একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে উঠল। সাক্ষী একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তার বাড়িতেই ফিবাসের কাঁধে ছুরি মারা হয়েছে।

বৃদ্ধা বলতে লাগল, "আমার নাম লা ফ্যালুরদেল। আমার একখানা দোতলা বাড়ি আছে। একতলায় আমি থাকি, দোতালাটা

ভাড়া দি। দিনরাত চরকায় সুতা কাটি।···এক রাতে আমি আমার ঘরে বসে সুতা কাটছি, এমন সময় দুজন লোক এল। একজন কালো পোশাক-পরা। তার সারা শরীর সেই কালো পোশাকে ঢাকা। শুধু চোখ দুটি দেখা যায়। তা যেন দুটি জ্বলন্ত কয়লা। আর একজন সেনাপুরুষ। দেখতে বেশ সুন্দর। সেনাপুরুষটি দোতলার সবচেয়ে ভাল ঘরটি সে রাতের জন্য ভাড়া চাইল। তারপর আমার হাতে ভাড়ার টাকা গুঁজে দিল। সে এর আগেও আমার এ ঘর এমনি ভাড়া নিয়েছে। টাকাটা আমার দেরাজে রেখে আমি তাদের উপরে নিয়ে গেলাম। ঘর খুলে দিলাম। নামবার সময় দেখি সেই কালো পোশাক-পরা লোকটি নেই। যেন মন্ত্রবলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমি একটু অবাক হলাম। যাক্ আমার টাকা পেয়ে গেছি, আমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামালাম না।···সেনাপুরুষটি আমার সাথে সাথে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই একটি মেয়েকে নিয়ে ফিরল। মেয়েটি তরুণী আর ভারী সুন্দর। তার সাথে একটা ছাগল। তার রং সাদা কি কালো, আমার মনে নেই। তবে ছাগলটাকে দেখে আমার মনটা কেমন করে উঠল। আমি কিছু না বলে সুতা কাটতে লাগলাম। আমার ঘরের ওপরের ঘরটিই সেনাপুরুষ ভাড়া নিয়েছে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে নদী দেখা যায়। ওপরের ঘরেও ঠিক এমনই একটা জানালা। আমার বাড়িটি ঠিক নদীর গায়ে। জানালা দিয়ে লাফ দিলে নদীতে পড়া যায়। সুতা কাটতে কাটতে সেই কালো পোশাক-পরা মূর্তি, আর ছাগল—এ দুজনই যেন আমার মন জুড়ে রইল। রাজপথে যে সন্ন্যাসীর ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়ায় তার কথাও মনে এল। মোট কথা অকারণেই আমার মনে যেন কেমন একটা ভয়ের ভাব এল।···

একটু বাদেই মেয়েটির চিৎকার আর তার সাথে সাথে মেঝের উপর ভারী কিছু পড়বার শব্দ কানে এল। আমি তখন আমার জানালা দিয়ে নদীর দিকে চেয়ে ছিলাম। তখন নদীর জলে চাঁদের আলো পড়েছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমার ওপরের ঘর

থেকে একটা ছায়ামূর্তি লাফিয়ে নদীতে পড়ল, তারপর সাঁতরাতে শুরু করল। তার পরনে ধর্মযাজকের পোশাক। ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। চিৎকার করে আমি পাহারাদার সৈন্যদের ডাকলাম। তাদের সাথে উপরে গিয়ে দেখি, আমার ঘরটি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সেনাপুরুষটি মেঝেয় পড়ে আছে, তার কাঁধে একটা ছোরা বিঁধে আছে। মেয়েটি মরার মত ভান করে পড়ে আছে। ছাগলটা ভয়ে কাঁপছে। সৈন্যরা সেই সেনাপুরুষ, মেয়ে ও ছাগলটিকে নিয়ে গেল। পরদিন ভোরবেলায় দেরাজ খুলে দেখি, টাকা নেই। সেখানে শুধু একটা শুকনো পাতা পড়ে আছে।"

তার এই সাক্ষ্য শুনে দর্শকেরা বলাবলি করতে লাগল, "সেই কালো ছায়ামূর্তি, সাদা ছাগল, শুকনো পাতা—এ নিশ্চয়ই ডাইনীর ব্যাপার।"

প্রধান বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই শুকনো পাতাটি এনেছ?"

"হ্যাঁ, ধর্মাবতার।"

আদালতের একজন কর্মচারী ওটা তার হাত থেকে নিয়ে প্রধান বিচারপতির হাতে দিল। তিনি আবার তা আর সবাইকে দিলেন।

সরকারী উকিল তখন বিচারকদের সম্বোধন করে তাঁর স্বভাব-সুলভ দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করলেন। বললেন, "সেনাপুরুষটি তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে বলেছে, কালো পোশাক-পরা মূর্তিটির সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখনই তার মনে কেমন একটা ভয় হয়েছিল। সেই তাকে মেয়েটির সাথে দেখা করবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। এমন কি ঘরভাড়ার টাকাটাও সেই দিয়েছিল।…তারপর এইমাত্র আপনারা শুনলেন, সে টাকা, শুকনো পাতা হয়ে গেছে। কাজেই টাকাটা যে ভৌতিক টাকা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। তারপর টাকা যদি ভৌতিক হয়, তবে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই ভৌতিক। তার মানে ডাকিনী বিদ্যার খেলা। আপনারা জানেন, ডাকিনীদের মায়ার শেষ নেই। তারা নানা বেশ ধারণ করতে পারে।

এখানেও তাই—কালো মূর্তি, ছাগল, ভৌতিক টাকা।…ফিবাসের জবানবন্দিও পরিষ্কার।"

ফিবাসের নাম শুনেই আসামী দাঁড়িয়ে উঠল। এতক্ষণ সে মাথা গুঁজে বসেছিল। গ্রীঁগোয়ার দেখল, সে তার এসমেরেলদা। তার মুখ কালো, চোখ বসে গেছে, ঠোঁট শুকনো, চুলগুলি রুক্ষ।

"ফিবাস্! আমার ফিবাস্ এখন কোথায়?" এসমেরেলদা কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞাসা করল। গ্রীঁগোয়ার মনে মনে আহত হল।…তার ফিবাস্! এজন্যই বুঝি এসমেরেলদা তাকে পাত্তা দিতে চাইত না।

"চুপ কর্। ফিবাসের কথা জেনে কি হবে?" বিচারক ধমক দিলেন।

"আপনারা শুধু দয়া করে বলুন, সে বেঁচে আছে তো?"

"তা জেনে যদি তোর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, তবে জেনে রাখ, সে মরতে বসেছে।"

এই কথা শুনে এসমেরেলদার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে আবার বসে পড়ল।

বিচারক তখন আদেশ দিলেন, "দ্বিতীয় আসামীকে হাজির কর।"

প্রহরী একটি ছাগল নিয়ে এল। তার পায়ের ক্ষুর ও মাথার শিং সোনালী রঙে গিল্টি করা। গ্রীঁগোয়ার দেখল, তার জালি।

এসমেরেলদাকে দেখামাত্র রেজিস্ট্রারের টেবিলের উপর দিয়ে লাফিয়ে, একজন কর্মচারীকে ধাক্কা মেরে, ছাগলটি তার মনিবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। হয়ত আশাও করল, তার মনিব তাকে আগের মতই আদর করবে। কিন্তু এসমেরেলদা চুপ করে রইল। জালির দিকে একবার ফিরেও চাইল না।

ফ্যালুরদেল ছাগলটি দেখেই বলল, 'হ্যাঁ, এই সেই ছাগল।"

সরকারী উকিল তখন বললেন, "আমরা এখন ছাগলটিকে জেরা করব।…যে প্রেতটা ছাগলের উপর ভর করেছে, এবং কোন মন্ত্রতন্ত্রেই যাকে ছাড়ানো যায়নি, আদালতের নামে তাকে আমি সাবধান করে

দিচ্ছি, সে যদি এই আদালতেও তার ডাকিনী বিদ্যার ভেলকি দেখায় তবে তাকে ফাঁসি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।”

এই বলে তিনি তাম্বুরিনটি ছাগলটার সম্মুখে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখন কটা বেজেছে ?”

জালি তার সোনালী ক্ষুর দিয়ে তাম্বুরিনে সাতবার আঘাত করল। সত্যই তখন ঘড়িতে ঠিক সাতটা।

গ্রীঁগোয়ার শিউরে উঠল। বেচারা যে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে !

সরকারী উকিল আবার তাম্বুরিন হাতে সেদিন কি বার, কি মাস —জিজ্ঞাসা করলেন। জালি ঠিক ঠিক উত্তর দিল।

জনতার মন ! দুইদিন আগেও যারা তার এই খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছে, আজ তারা সহজেই বিশ্বাস করল, সবই ভৌতিক ব্যাপার।

এবার একজন বিচারক স্বয়ং জালির গলা থেকে থলিটি খুলে নিয়ে ভেতরকার অক্ষরগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে দিলেন। জালি তখন আরও সাংঘাতিক কাজ করে বসল। সে তার ক্ষুর দিয়ে অক্ষরগুলি সাজাতে শুরু করল। সাজানো শেষ হলে দেখা গেল, সে ‘ফিবাস্’ কথাটি লিখেছে।

ক্যাপটেন ফিবাস্ যে ডাকিনীর হাতেই প্রাণ দিয়েছে, বিচারক এবং দর্শক সকলেই জালির এ ব্যাপারটাকে অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করল।

যে এসমেরেলদা তাদের কাছে এতদিন ছিল অপরূপ সুন্দরী, আজ তাকে তারা একটা মায়াবিনী ডাইনী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারল না।

এসমেরেলদার এতক্ষণ কোন জ্ঞান ছিল না। সে চোখ বুজে চুপ করেই বসেছিল। সরকারী উকিল তাকে একটা ধাক্কা মেরে বললেন, “তুমি বোহেমিয়ার লোক। ডাকিনী বিদ্যার জোরে লোককে তুক করাই তোমার পেশা। তুমি তোমার ছাগলটাকে নিয়ে গত

২৯শে মার্চ রাত্রিতে ক্যাপটেন ফিবাসের কাঁধে ছুরি মেরেছ। তাকে হত্যা করেছ। বল, এ অভিযোগ সত্য কি না?"

"আমি আমার ফিবাসের কাঁধে ছুরি বসিয়েছি, আমি তাকে হত্যা করেছি! কি সাংঘাতিক মিথ্যে কথা!"

"তুমি তাহলে এই অভিযোগ অস্বীকার করছ?"

এসমেরেলদা তখন উঠে দাঁড়াল। তার চোখে তখন জলের বদলে আগুন। উত্তেজনায় সে কাঁপছে। সে ক্ষীণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল "এ সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।"

"তবে কে তাকে ছুরি মেরেছে?"

"ঠিক বলতে পারব না। কেবল এইটুকু জানি, এ একজন ধর্ম-যাজকের কাজ। সেই ধর্মযাজক কে তাও জানি না। অনেকদিন ধরেই সে আমার পিছু নিয়েছিল।"

"এর বেশী কিছু জান না?"

"না।"

"তোমার দোষ অস্বীকার করছ?"

"আমি তো আমার কথা বলেছি।"

সরকারী উকিল তখন বললেন, "আসামী যেমন সাংঘাতিক চরিত্রের মেয়ে, তেমনই একগুঁয়ে। কিছুতেই সে তার অপরাধ স্বীকার করছে না। এক্ষেত্রে আমার প্রার্থনা আসামীকে জেরা-ঘরে নেবার জন্য অনুমতি দেওয়া হোক্।"

প্রধান বিচারপতি তৎক্ষণাৎ সে আবেদন মঞ্জুর করলেন।

নামে জেরা-ঘর। আসলে এটি একটি নরক!

যে সব অপরাধী তাদের অপরাধ স্বীকার করতে চায় না, এখানে এনে তাদের উপর অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার করা হয়। সে অত্যাচার সহ্য করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। তাই অত্যাচারের ভয়ে অনেকে দোষী না হয়েও দোষ স্বীকার করে।

বিচারকদের পাশেই মাটির নীচে এই জেরা-ঘর। বিচারকের আদেশে প্রহরীরা এসমেরেলদাকে ধরে পাশের জেরা-ঘরের দোরে

দাঁড়াতেই দোরটি খুলে গেল। সবার সাথে এসমেরেলদা ভেতরে প্রবেশ করল। দোরটি আবার বন্ধ হয়ে গেল।

গ্রীঁগোয়ারের মনে হল, একটা রাক্ষস যেন হাঁ করে এসমেরেল-দাকে গিলে ফেলল। এসমেরেলদাকে দেখতে না পেয়ে ছাগলটা করুণ স্বরে ভ্যা ভ্যা করতে লাগল।

বিচারকদের খাবার সময় হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। তাই তাঁরা প্রোভোস্টের উপর জেরা-ঘরের ভার দিয়ে উঠে গেলেন।

আদালতের কাজ তখনকার মত স্থগিত রইল।

॥ ২৩ ॥

জেরা-ঘরটি মাটির নীচে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। প্রহরীদের হাত ধরে ধরে এসমেরেলদা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জেরা-ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটি গোলাকৃতি। একটিমাত্র দরজা ছাড়া ঘরে আর কোন দরজা বা জানালা নেই। একদিকে দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চুল্লী তাতে গনগনে আগুন। সেই আগুনের আভায় ঘরটি রক্তাভ উজ্জ্বল, এক কোণে একটি মোমবাতি। কিন্তু এই আগুনের আলোয় তাকে জোনাকির মত নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে।

চুল্লীটিকে একটি লোহার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ঢাকনাটি একবার উঠাতেই মনে হল, রূপকথার রাক্ষস যেন হাঁ করে আগুন বমি করছে। লেলিহান অগ্নিশিখাগুলি যেন সেই রাক্ষসেরই করাল দংষ্ট্রাপঙ্‌ক্তি।

সেই তীব্র আলোয় এসমেরেলদা সভয়ে দেখল চারদিকে নানা রকমের যন্ত্রপাতি থরে থরে সাজানো। এক একটির এক এক রকম আকৃতি; এক এক রকম গড়ন।

ঘরের মধ্যে একটি চামড়ার গদি পাতা। একটা চামড়ার ফিতার এক মাথা দেওয়ালে একটা আংটার সাথে বাঁধা, আর এক মাথা গদির উপর।

চুল্লীর আগুনে সাঁড়াশি, কাটারি, চিমটা প্রভৃতি অনেকগুলি যন্ত্র গরম করা হচ্ছে। অনেকক্ষণ আগুনে পুড়ে পুড়ে সেগুলি লাল টকটকে দেখাচ্ছে।

জল্লাদ এক পাশে দাঁড়িয়ে। তার দুজন সহকারী চুল্লীর কয়লা খুঁচিয়ে দিচ্ছিল, যাতে গনগনে আগুন হয়।

একদিকে প্রোভোস্ট। একদিকে ধর্মযাজক। কাগজ কলম নিয়ে রেজিস্টার আর এক পাশে।

এ সব দেখে এসমেরেলদার হাত পা ভয়ে অবশ হয়ে এল, গলা শুকিয়ে গেল, বুক কাঁপতে লাগল।

প্রোভোস্ট তাকে বললেন, "ভেবে দেখো তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করবে কি না।"

"আমি তো কোন অপরাধ করিনি।"

"ফিবাসকে তুমি হত্যা করোনি?"

"না।"

"তাহলে বাধ্য হয়েই আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তুমি সত্য কথা বলতে বাধ্য হও।···যাও ওই গদিটার ওপর গিয়ে বস।"

এসমেরেলদা দাঁড়িয়েই রইল। এই গদির উপর গেলে না জানি তার উপর কি অত্যাচার হবে। তাই সেখানে যেতে তার সাহস হল না।

তখন প্রোভোস্টের আদেশে দুই জন প্রহরী তাকে ধরে নিয়ে গদির উপর বসিয়ে দিল।

এসমেরেলদার বুক কাঁপতে লাগল। তার মনে হল, ঘরের চার দিকের যন্ত্রপাতিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারা যেন, তাকে চেপে ধরবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। সে আবার চোখ বুজল।

বড় বড় পাথরের চাঁই বিদ্রোহীদের মাথার উপর পড়তে লাগল।

প্রোভোস্ট জিজ্ঞাসা করলেন, "চিকিৎসক কোথায় ?"

কালো কোটপরা এক ব্যক্তি উত্তর দিল, "এই যে আমি এখানে।"

প্রোভোস্ট এস্‌মেরেলদাকে বললেন, "এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখনও তুমি ফিবাস্‌কে হত্যার অপরাধ অস্বীকার করছ ?"

এস্‌মেরেলদা কোন জবাব দিল না। শুধু আপন মনে বলল, "ফিবাস্, তুমি কোথায় !"

"তাহলে আমাদের কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়েই আমাদের কর্তব্য করতে হবে।"

তিনি জল্লাদকে ইঙ্গিত করলেন—"তোমাদের কাজ শুরু কর।"

"কোন্‌টা দিয়ে শুরু করব ?"

প্রোভোস্ট একটু ইতস্ততঃ করলেন। মেয়েটির কচি মুখ আর সুন্দর চেহারা দেখে হয়ত তাঁর মনে একটু দয়া হচ্ছিল। তারপর বললেন, "প্রথমে স্ক্রু আঁটা কাঠের জুতা দিয়েই শুরু কর।"

সহকারী দুজন এক জোড়া কাঠের জুতা নিয়ে এল। জুতা দুটি এমন যে তা পায়ে পরিয়ে স্ক্রু আঁটতে থাকলে পায়ের উপর কেটে কেটে বসতে থাকে।

তারা জুতা জোড়াটি এস্‌মেরেলদার পায় পরিয়ে দিল। যে সুন্দর ছোট পা দুখানির লীলায়িত নৃত্য ছন্দ এতদিন এত লোককে মুগ্ধ করেছে, আজ তা চিরকালের জন্য নষ্ট হতে চলল।

এস্‌মেরেলদা কাতর স্বরে বলল, "ও দুটো আমার পা থেকে খুলে নাও।" বলে গদি থেকে লাফিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু কাঠের জুতায় পা আটকা থাকায় সে দাঁড়াতে পারল না, জুতাসুদ্ধ গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল।

তাকে আবার গদির উপর বসান হল। তারপর সেই চামড়ার ফিতেটি তার কোমরে শক্ত করে বাঁধা হল, যাতে সে আর নড়াচড়া করতে না পারে।

প্রোভোস্ট আর একবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনও বলো, তুমি অপরাধী।"

"আমি নির্দোষ। সত্যিই আমি কিছু করিনি।"

জল্লাদ তখন স্ক্রু কষতে লাগল, আর জুতাজোড়া এস্‌মেরেলদার কোমল পায়ে কেটে কেটে বসতে লাগল। সে কি কষ্ট!

এস্‌মেরেলদা এ কষ্ট সইতে না পেরে চিৎকার শুরু করল।

"দোষ স্বীকার কর। তাহলেই আর এ কষ্ট পেতে হবে না।"

"স্বীকার করছি। সব মেনে নিচ্ছি। এ যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্তি দিন।"

"ভেবে চিন্তে বলো। দোষ স্বীকার করলে, তোমার শাস্তি হবে মৃত্যু।"

"মৃত্যুই আমি চাই।"

প্রোভোস্ট তখন রেজিস্ট্রারকে বললেন, "আপনি লিখে নিন।" এস্‌মেরেলদাকে বললেন, "তুমি স্বীকার করছ ডাকিনী বিদ্যার সাহায্যে লোককে তুক করা তোমার পেশা?"

"স্বীকার করছি।"

"তুমি শয়তানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াও?"

"হ্যাঁ।"

"২৯শে মার্চ রাতে ছায়ামূর্তি সন্ন্যাসী আর ছাগল নিয়ে তুমি ক্যাপটেন ফিবাস্‌কে হত্যা করতে গিয়েছিলে?"

উত্তর দিতে গিয়েও এস্‌মেরেলদার মুখে প্রথমে কথা ফুটল না। তারপর কে যেন ভেতর থেকে জোর করে তার মুখ দিয়ে বার করল, "হ্যাঁ।" বলেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

"রেজিস্ট্রার মশায়, সব ঠিক ঠিক লিখে নিয়েছেন তো?...এবার আসামীর পা থেকে জুতা জোড়া খোলা হোক্।...চলুন এবার আমরা আদালতে যাই।"

বিচারকক্ষে এসে তিনি ঘোষণা করলেন, "আসামী সত্যকথা

স্বীকার করেছে। এই সত্যের ভিত্তিতেই সুবিচার হবে। কোন দিকেই আর সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। সত্যের জয় হোক্।"

তখন বেশ রাত হয়েছে। বিচারকক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন, যেন এস্‌মেরেলদারই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

প্রধান বিচারপতি বললেন, "বোহেমিয়ার মেয়ে, তুমি স্বীকার করছ, তুমি ডাকিনী বিদ্যার চর্চা কর, শয়তানের সাথে ঘুরে বেড়াও, ফিবাস্‌কে হত্যা করেছ?"

এস্‌মেরেলদা কি উত্তর দেবে! তার দেহ মন তখন অসাড়। শুধু বলল, "সব স্বীকার করছি, সব। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন, আমি আর সইতে পারছি না।"

তার কথা কে শোনে? সরকারী উকিল আবার বক্তৃতা শুরু করলেন, অনেক কিছু বুঝাতে চাইলেন, শেষে ছাগলটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "এ ব্যাপারে যে শয়তানের যোগাযোগ আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন।"

বিচারকগণ দেখলেন, ছাগলটি টেবিলের উপর বসে এমন ভাবে পা এবং মাথা নাড়াচ্ছে, যেন সরকারী উকিলের বক্তৃতা নকল করছে।

আসামী পক্ষের উকিল উঠে দাঁড়াতেই বিচারকগণ তাঁর বক্তব্য খুব সংক্ষেপ করতে বললেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ করে আসামী নির্দোষ বলে আদালতের দয়া ভিক্ষা করলেন।

প্রধান বিচারপতি রায় দিলেন, "ডাকিনী বিদ্যার চর্চা এবং ফিবাস্‌কে হত্যা করার অপরাধে এস্‌মেরেলদার উপর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হল। যেদিন তার ফাঁসি হবে, সেদিন বেলা ঠিক বারোটার সময় তাকে গাড়ি করে নোৎরদাম্ গির্জার সম্মুখে নিতে হবে। সেখানে সে তার অপরাধের জন্য শেষ উপাসনা করবে। তারপর তাকে গ্রীভের ফাঁসিমঞ্চে ঝুলিয়ে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দীদশায় থাকতে হবে। ফাঁসি কবে দেওয়া হবে, তার দিন পরে ঠিক করা হবে।"

দণ্ডাদেশ শুনে এস্‌মেরেলদার মনে হল, সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

॥ ২৪ ॥

এস্‌মেরেলদা এখন অন্ধকার কারাগারে বন্দিনী। সেখানে আলো নেই, বাতাস নেই, শব্দ নেই। সেখানে শুধু অন্ধকার। সেখানে দিন নেই, দিনের উত্তাপ নেই। সেখানে কেবল হিমশীতল রাত্রি। সেখানে প্রাণচঞ্চল পৃথিবীর কোন শব্দ নেই। সেখানে শুধু স্তব্ধতা।

সারাদিনের মধ্যে কারারক্ষী দু'বার দরজাটি খোলে, তাকে আধ-পোড়া একটা রুটি, একটু জল দিয়ে যায়। তখনই এই অন্ধকারে যা একটু আলো প্রবেশ করে। ফাটা ছাদের এককোণ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে, তারই যা একটু শব্দ কানে আসে। এ ছাড়া এস্‌মেরেলদার বর্তমান জগতে শুধু অন্ধকার, শুধু মৃত্যুর শীতলতা। পৃথিবীর যে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ আছে এস্‌মেরেলদা সব তা' ভুলে গেছে। দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়, অনিদ্রায় তার দেহ মন অবসন্ন, অসাড়। তার হাতে পায়ে লোহার শিকল, ভিজে মেঝেতে তৃণশয্যা। কতদিন সে সেখানে আছে, তা তার মনে নেই। আরও কতদিন থাকতে হবে, তাও জানে না। কখন রাত হয়, কখন ভোর হয়, কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

তারপর একদিন, তখন দিন কি রাত তা সে জানে না, সে শুনতে পেল, কে যেন চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলছে। তারপর সেই ভারী দরজা খুলে গেল, আর তার ভিতর দিয়ে একটি লণ্ঠন, একখানি হাত, একটি লোকের দুখানি পা দেখা গেল। লণ্ঠনের আলোয় তার চোখ যেন ঝলসে গেল, সে তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করল।

তারপর যখন চক্ষু মেলল, দেখল, দরজাটি বন্ধ! লণ্ঠনটি সিঁড়ির উপর রয়েছে, আর তার সামনে একজন দাঁড়িয়ে। তার আপাদ-মস্তক কৃষ্ণবর্ণের পোশাকে আবৃত। এস্‌মেরেলদা স্থির দৃষ্টিতে সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল।

দুজনেই নীরব। কারও মুখে কোন কথা নেই। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। শেষে এস্‌মেরেলদাই প্রথম মুখ খুলল। জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?"

"একজন ধর্মযাজক।"

এস্‌মেরেলদা সে কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। এ স্বর যেন আগেও শুনেছে।

তিনি বললেন, "তুমি তবে মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ। এই দণ্ডে, এই মুহূর্তেই তার ব্যবস্থা হয় না?"

"না, কাল তোমার ফাঁসির দিন ঠিক হয়েছে।"

"এখনও কাল! হা ভগবান্। আজ হলেই বা কার কি ক্ষতি হত।"

"কেন তুমি মরতে চাও?"

"জানি না।"

"কেন তোমার এ বন্দীদশা জানো কি?"

"একসময় হয়ত জানতাম। এখন আর মনে নেই।"

এস্‌মেরেলদা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল। বলল, "এ জীবন আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমি আর পারছি না। আমি মুক্তি চাই। আমি এখান থেকে পালাতে চাই।"

"তবে আমার সাথে এস।" এই বলে তিনি তার হাত ধরলেন। এস্‌মেরেলদার মনে হল, সে স্পর্শ যেন মৃত্যুর চেয়েও শীতল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?"

তিনি তাঁর মুখের আবরণ সরাতেই এস্‌মেরেলদা আঁতকে উঠল। এ যে সেই, যে এতদিন তার পেছন পেছন ঘুরছে, যাকে সে সেই নিদারুণ রাতে লা ফ্যাঁলুরদেলের ঘরে ছোরা হাতে শেষ দেখেছে।

তার পাপগ্রহ, তার শনি। ধর্মযাজক! আর তার কাছেই এতক্ষণ সে মুক্তির জন্য মিনতি জানিয়েছে।

এস্‌মেরেলদার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। সে মাটিতে বসে পড়ল।

শিকারী বিড়াল শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার আগে যে দৃষ্টিতে শিকারের দিকে চেয়ে থাকে, ক্লঁ্যদ ফ্রোলো সেই দৃষ্টিতেই এস্‌মেরেলদার দিকে চেয়ে রইলেন।

সে দৃষ্টি এস্‌মেরেলদার অসহ্য মনে হল। সে করুণ স্বরে বলল, "আর কেন? এবার আমায় শেষ করুন। কেন আপনি আমায় এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন? আমি আপনার কি করেছি?"

"কি করেছ? তুমি আমার চোখের ঘুম, মনের শান্তি সব কেড়ে নিয়েছ। আমি তোমায় ভালবাসি।"

"ও! আরো কত সইতে হবে!"

"তুমি আর কতটুকু সহ্য করেছ? জান, এ বুকে কত জ্বালা। যে কথা কেউ জানে না, আজ তাই শোন। আমি তো আগে এমন ছিলাম না। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান এ সব নিয়েই দিন কাটাতাম। ভাবতাম জীবন বুঝি তাই। মাঝে মাঝে মন হয়ত চঞ্চল হত, কিন্তু সে ক্ষণিক চাঞ্চল্য। বই পড়ে উপাসনা করে সে চাঞ্চল্য দূর করতাম। কিন্তু কি কুক্ষণে তুমি আমার চোখে পড়লে!···আমি আমার ঘরে বসে বই পড়ছি, তুমি পথে নাচছ। হঠাৎ তোমার উপর আমার নজর পড়ল। আমি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। তুমি এত সুন্দর, এমন কোমল! জানতাম এ অন্যায়। কিন্তু মন তখন আমার শাসনের বাইরে। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারালাম, পাগল হয়ে গেলাম। উন্মাদের মত তোমার পিছু পিছু ছুটেছি, শুধু তোমাকে দেখব বলে। দেখে আর আশ মিটল না। তোমাকে পাবার জন্য হাত বাড়ালাম। এক রাতে তোমাকে পথ থেকে চুরি করবার চেষ্টা করলাম। বিফল হলাম। বেচারী কোয়াসিমোদো তার জন্য শাস্তি ভোগ করল। নিরপরাধ তার এই শাস্তিতেও আমার চৈতন্য হল না। আমি—"

এস্‌মেরেলদা কাতর কণ্ঠে বলল, "থামুন। আমি আর শুনতে চাইনে।"

"আমায় আজ বাধা দিও না। আমার জমান ব্যথা হালকা করতে দাও। শোন।" তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "আমি গির্জার কাজকর্মে অমনোযোগী হলাম, উপাসনা ভুললাম। আমার মনে তখন দিনরাত এক চিন্তা।...সে তুমি। আমি জানতাম, তুমি সামান্য বেদের মেয়ে। পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তোমার নেশা। নাচগানে লোক ভুলানোই তোমার পেশা। তবুও আমার মোহ কাটল না। ভাবলাম সরকারী আদেশে যদি তোমার নাচগান বন্ধ করা যায়, তবে তুমি আমার চোখের আড়াল হবে, তোমায় ভুলতে পারব। কিন্তু সরকারী আদেশ তুমি গ্রাহ্যই করলে না।...তোমায় তবু ভুলবার চেষ্টা করছিলাম, সে চেষ্টা হয়ত বা সফল হত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম। তাই ক্যাপটেন ফিবাসের নাম যেদিন শুনলাম, সেদিন আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। সাথে সাথে ফ্যালুরদেলের বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। তার পরের ইতিহাস তো তুমি জান।"

এতক্ষণ পর এস্‌মেরেলদা মুখ খুলল। বলল, "আমার ফিবাস্ তুমি কোথায় ?"

"দোহাই তোমার, তার নাম আর মুখে এনো না। তোমার এই দুর্ভাগ্যের জন্য সেই দায়ী, আমার এ দুরবস্থাও তারই জন্য। তোমার বিচারের সময় আমিও ছিলাম একজন বিচারক। তোমার বিচারের নামে তোমার উপর উৎপীড়ন হচ্ছিল, আর আমার বুক চিরে যাচ্ছিল। এই দেখ, নিজের বুক নিজে চিরেছি। এ আর কতটুকু ক্ষত ? এ আর কি ব্যথা! এর চেয়ে শতগুণ ক্ষত, লক্ষগুণ ব্যথা আমার মনে। যাকে আমি ভালবাসি, সে আমাকে চায় না, আরেকজনের প্রতি অনুরাগী, ওঃ এ যে কি ব্যথা, তুমি কি বুঝবে এস্‌মেরেলদা ?...তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার দিকে চাও। আমাকে দয়া কর।"

এই বলে সত্য সত্যই তিনি তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

এস্‌মেরেলদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, "হায় ফিবাস্!"

"এমন নির্দয় হয়ো না। দয়া কর। আমায় দয়া কর। কাল তোমার ফাঁসির দিন। তাই আমি অস্থির হয়ে ছুটে এসেছি। তুমি রাজী হলে তোমাকে নিয়ে এমন জায়গায় যাব যেখানে ফাঁসির দড়ি পৌঁছুবে না; সেখানে শুধু তুমি আর আমি। আমাদের সেই নিভৃত নিকুঞ্জে থাকবে শুধু প্রভাতের আলো, পাখির কাকলি। আজ তুমি আমায় ভালবাসতে পারছ না। না পারো ক্ষতি নেই। আমি আশা করে থাকব—একদিন তুমি আমায় ভালবাসবে।"

এস্‌মেরেলদার মুখে বিকট হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনার হাতের দিকে চেয়ে দেখুন। সে হাতে এখনও ফিবাসের রক্তের দাগ লেগে আছে।"

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো বিমূঢ়ের মত তার হাতের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, "কালই তোমার ফাঁসির দিন। তারপরই সব শেষ। তোমার এ পরিণতির কথা আমি যে ভাবতেও পারছি না। তোমায় যে আমি এত ভালবাসি, এর আগে আমি নিজেও হয়ত তা জানতাম না। বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। তুমিও বাঁচো। চল, আমরা এখান থেকে পালাই।"

এই বলে তিনি তার হাত ধরতে গেলেন।

এস্‌মেরেলদা জিজ্ঞাসা করল, "আমার ফিবাস্ কোথায়? সে কেমন আছে?"

"আবার ফিবাস্?···সে মরে গেছে।"

"তবে আর আমায় বাঁচবার লোভ দেখাচ্ছেন কেন?"

এই বলে সে হিংস্র বাঘিনীর মত ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "খুনে শয়তান! আমার সামনে থেকে দূর হ। আমার আর ফিবাসের রক্ত যেন চিরদিন তোর কপালে কলঙ্কের মত লেগে থাকে!"

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো চলে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর পদধ্বনি মিলিয়ে গেল। এস্‌মেরেলদা উত্তেজনায়, অবসাদে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

॥ ২৫ ॥

ক্যাপটেন ফিবাসের মৃত্যু হয়নি। তার আঘাত যতটা গুরুতর মনে করা হয়েছিল, আসলে তা হয়নি। সে যখন শয্যাশায়ী তখন তার জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল। তারপর তার কি হল, এ নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামানো দরকার মনে করল না। বিচারকরা ধরেই নিয়েছিলেন, ফিবাসের মৃত্যু হয়েছে। এস্‌মেরেলদাও অপরাধ স্বীকার করেছিল। তাই বিচারকরা তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েই বিচারের মর্যাদা রক্ষা করলেন।

সুস্থ হয়েও ফিবাস্ এস্‌মেরেলদার বিচারের সময় উপস্থিত থাকা সমীচীন মনে করেনি! সে ভেবেছিল, সে না থাকলে ব্যাপারটা নিয়ে তেমন হইচই হবে না। ফ্ল্যুর দ্য লিজের কান পর্যন্ত পৌঁছুবে না।

তাই মাস দুই পর ফিবাস্ একদিন তার ভাবী বধূর সাথে দেখা করতে এল। আসবার সময় দেখল নোৎরদাম্ গির্জার সম্মুখে জনতার ভিড়। এ নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না। ভাবল, গির্জায় হয়ত কোন উৎসব হবে।

এতদিন পর ফিবাস্‌কে দেখে তার ভাবী বধূর মনে অভিমান জেগে উঠল। অনুযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করল, "এই দু' মাস কোথায় ছিলে?"

ফিবাস্ সত্য ঘটনা গোপন করে বলল, একজন সেনাপুরুষের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সামান্য আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল। সুস্থ হবার পরও কিছুদিন সেনা-নিবাসে কাটাতে হয়েছে।

ফ্ল্যুর দ্য লিজ খুঁটে খুঁটে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। অসংলগ্ন উত্তর দিতে গিয়ে ফিবাস্ এক সময় বেকায়দায় পড়ে গেল। তখন কথা ঘুরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করল, "গির্জার কাছে আজ এত ভিড় কিসের?"

"আমি ঠিক জানি না। শুনেছি ফাঁসি দেওয়ার আগে একটা

ডাইনীকে নাকি শেষ উপাসনার জন্য নোৎরদাম্ গির্জার সামনে আনা হবে।”

সেই ডাইনী যে এস্‌মেরেলদা, ফিবাস্ তা কল্পনাও করতে পারেনি। তার ধারণা, এস্‌মেরেলদার ব্যাপার অনেকদিন আগেই চুকে গেছে। তাই জিজ্ঞাসা করল, “ডাইনীটা কে? নাম শুনেছ না কি?”

“না।”

“তার অপরাধ কি?”

“তাও জানি না।”

তার ভাবী বধূকে একান্তে পেয়ে ফিবাস্ তাকে আদর জানাতে গেল। ফ্লু্যর্ দ্য লিজ তখন ছুটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। ফিবাস্‌ও তার পিছনে পিছনে গেল।

নোৎরদাম্ গির্জার সামনে পথের উপর জনতার ভিড় তখন বেড়েই চলেছে। তাদের মধ্যে গুঞ্জন, কোলাহল শুরু হয়েছে। এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। আশেপাশের বাড়ির সব কয়টি দরজা জানালায় উৎসুক মুখ উঁকি মারতে লাগল। সবাই বলাবলি করছে, “ওই আসছে।”

দেখা গেল একটা খোলা গাড়ি এদিকেই আসছে। তার চার ধারে সশস্ত্র প্রহরী। প্রোভোস্ট ও তাঁর কর্মচারীরাও সাথে সাথে আসছে।

গাড়ির উপর একটি তরুণী। তার হাত দুখানি পিছন দিকে বাঁধা। পা দুটি খালি। পরনে শুধু একখানি কাপড়। মাথার চুল অবিন্যস্ত। গলায় একটি কালো দড়ির ফাঁস। তার ফাঁক দিয়ে একটা মাদুলি দেখা যাচ্ছে। প্রহরীরা তার শরীর থেকে আর সবই খুলে নিয়েছে, খুব একটা সামান্য জিনিস ভেবে এটা আর খোলেনি। তার পায়ের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ছাগল।

“হা ভগবান! এ যে সেই বেদের মেয়েটা।”

ফিবাস্‌ও তাকে দেখেছিল। কিন্তু না দেখার ভান করে জিজ্ঞাসা করল, “কোন্ মেয়েটা?”

"সেই যে মাস দুই আগে তার ছাগল নিয়ে খেলা দেখাতে এসেছিল।" নিজের মনে আবার সেই পুরানো ঈর্ষ্যা জেগে উঠল।

পাছে এস্‌মেরেলদার চোখ তার উপর পড়ে, এই ভয়ে ফিবাস্ ঘরের ভিতর যাবার উপক্রম করতেই ফ্লুঁ্যর দ্য লিজ ঠাট্টা করে বলল, "একটা বেদের মেয়েকে দেখে ভয় পাচ্ছ নাকি? এখানেই বস। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক্ না।"

কারাগারে বন্দিনী থেকে এস্‌মেরেলদা অনেক শুকিয়ে গেছে, রংও ময়লা হয়েছে। তবুও তার রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হল। তার এই দুরবস্থায় কারও কারও মনে দয়াও হল।

গাড়িখানি নোৎরদাম্ গির্জার সামনে এসে থামল। প্রহরীর দল দুই পাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল। জনতাও শান্ত হল। গির্জার সুবৃহৎ দরজাটিও ঈষৎ উন্মুক্ত হল।

ভিতরে বেদীর উপর কয়েকটি মোমবাতি অচঞ্চল শিখায় জ্বলছে। বেদীর শেষ প্রান্তে একটি রৌপ্য ক্রুশদণ্ড। অন্ধকারের পটভূমিকায় তাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

নির্জন বেদী মণ্ডপে কয়েকজন ধর্মযাজকের কেশবিরল মস্তক দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ভজন সংগীত গাইছেন। সেই সংগীতের উদাত্ত সুর বাতাসে ভেসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

জনতা স্তব্ধ হৃদয়ে সে সংগীত শুনতে লাগল।

এস্‌মেরেলদা বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে গাড়ির উপর বসে ছিল। প্রহরীরা তার হাতের বাঁধন খুলে গাড়ি থেকে নামাল। সে তখন মাটির উপর বসে পড়ল। তার গলার কালো ফাঁসটি সাপের লেজের মত মাটিতে লুটাতে লাগল। ছাগলটি মুক্তি পেয়ে লাফালাফি শুরু করল।

এস্‌মেরেলদা নিস্তব্ধ। শুধু তার মুখে একটি অর্ধস্ফুট অস্পষ্ট শব্দ—ফিবাস্!

এদিকে ধর্মযাজকগণ একটি সোনার ক্রুশদণ্ড ও জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে এদিকেই এগিয়ে এলেন। তাঁদের কণ্ঠে উদাত্ত ভজন সংগীত। মৃত্যুপথযাত্রী আত্মার শান্তির জন্য তাঁরা প্রার্থনা করছেন।

ধর্মযাজকদের মধ্যে সকলের আগে যিনি আসছিলেন, তাঁর দিকে চেয়েই এস্‌মেরেলদার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এখানেও সেই ধর্মযাজক।

ক্ল'দ ফ্রোলো এস্‌মেরেলদার হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি তুলে দিলেন। তখন তাঁকে এমন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল যে, তিনি যেন জীবন্ত মানুষ নন, নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি।

একজন ধর্মযাজক প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন, কিন্তু তার এক বর্ণও এস্‌মেরেলদার কানে প্রবেশ করছিল না। তাঁর শেষ মন্ত্রটি উচ্চারিত হলে শুধু যন্ত্রচালিতের মত বলল, "স্বস্তি।"

ক্ল'দ ফ্রোলো তখন প্রহরীদের সরিয়ে দিলেন। তারপর এস্‌মেরেলদার কাছে এসে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "তুমি তোমার অপরাধের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ তো?" তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, "এখনও ভেবে দেখো। এখনও তোমায় বাঁচাতে পারি।"

এস্‌মেরেলদা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস্ করে উঠল। বলল, "দূর হও শয়তান। নইলে সবার সামনে তোমার কীর্তিকলাপ প্রকাশ করে দেব।"

"তাতে তোমার লাভ হবে না। কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

"আমার ফিবাসের কি হয়েছে বল। বল, সে বেঁচে আছে।"

"না, সে বেঁচে নেই।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আর্চডিকনের দৃষ্টি রাস্তার ওপারের প্রাসাদ অলিন্দে গিয়ে পড়ল। সেখানে ফিবাস্ দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। তার পাশে সুবেশা এক তরুণী।

ফিবাস্‌কে দেখে ক্ল'দ ফ্রোলোর মন বিষিয়ে উঠল। এস্‌মেরেলদাকে বললেন, "তবে মর। কেউ তোমাকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না।"

তারপর জোরে জোরে বললেন, "অনন্ত পথের যাত্রী, ভগবান্ তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন।"

এস্‌মেরেলদার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান শেষ হল। ধর্মযাজকরা বেদীর দিকে ফিরে গেলেন। তাঁদের ভজন সংগীত মৃদু হতে মৃদুতর হতে হতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল।

॥ ২৬ ॥

এস্‌মেরেলদা স্থাণুর মত বসে ছিল। প্রহরীরা আবার তার হাত দুটি আগের মতই বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে যখন গাড়িতে তুলবে, তখন এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তরুণীর মনে জীবনের সাধ জেগে উঠল। তার শুষ্ক রক্তচক্ষু সে একবার উপরে সূর্যের দিকে, আকাশের দিকে, মেঘের দিকে তুলে ধরল। পরমুহূর্তে তা আবার জনতার উপর, সামনের বাড়ির অলিন্দে পতিত হল।

সেখানে তার ফিবাস্ দাঁড়িয়ে। ফিবাস্—তার ফিবাস্—তার জীবন-দেবতা। তার সৌম্য মূর্তি, পরনে সেনাপুরুষের ঝকঝকে পোশাক, মাথায় উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, কোষে তরবারি।

ফিবাস্ বেঁচে আছে। তার মৃত্যু হয়নি। বিচারক তাকে মিথ্যে বলেছেন, ধর্মযাজক তাকে প্রতারিত করেছেন। সে আর স্থির থাকতে পারল না! ব্যাকুল কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল, "ফিবাস্, আমার ফিবাস্!"

তার হাত দুখানি বাঁধা না থাকলে সে হয়তো বাহু বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইত।

তার ডাক শুনে ফিবাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। পাশের তরুণীটির কানে কানে কি বলল, তারপর দুজনেই বারান্দা ছেড়ে ভিতরে চলে গেল।

এস্‌মেরেলদা আবার ভেঙে পড়ল। তবে কি ফিবাস্‌ও বিশ্বাস

করেছে সে-ই তার কাঁধে ছুরি বসিয়েছে! তার এতক্ষণে মনে হল, ফিবাসকে হত্যার দায়েই তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত ফিবাসের আশায় সে সব আঘাত নীরবে সহ্য করেছে। কিন্তু এই শেষ নিষ্ঠুর আঘাত সে আর সইতে পারল না। সে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ল।

প্রভোস্ট আদেশ দিলেন, "আর দেরি নয়। এবার আসামীকে গাড়িতে তোল।"

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি, গির্জার প্রবেশপথের ঠিক উপরে যেখানে রাজারাজড়াদের প্রতিমূর্তি রয়েছে, সেখান থেকে কোয়াসিমোদো সব কিছুই মন দিয়ে দেখছে। উপরের গ্যালারি থেকে তার গলাটি সে এতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তার পরনে সাদা লাল মেশানো পোশাকটি না থাকলে তাকেও গির্জার গায়ে খোদিত একটা দৈত্যমূর্তি বলেই ভুল হত।

প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের শুরু হতেই সে একটি গিঁট দেওয়া শক্ত দড়ির এক প্রান্ত একটা থামের সাথে বেঁধে অন্য প্রান্ত প্রবেশদ্বারের মাথায় নামিয়ে দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

যেই প্রভোস্টের আদেশে প্রহরীরা এসমেরেলদাকে গাড়িতে তুলবার উদ্যোগ করছে, অমনি সে সেই দড়িটি দু হাতে, দু পায়ে ও দু জানুতে চেপে ধরে তরতর করে নীচে নেমে এল। তারপর দুই ঘুষিতে প্রহরী দুজনকে ভূমিসাৎ করে এসমেরেলদাকে ছোট একটা পুতুলের মতো ধরে এক লাফে গির্জার ভিতরে প্রবেশ করল। তারপর তাকে মাথার উপরে তুলে চিৎকার করে বলতে লাগল—"স্যাংচুয়ারি! স্যাংচুয়ারি!"

সমস্ত ব্যাপারটা যেন চোখের নিমেষে ঘটে গেল। প্রভোস্ট এবং রাজকর্মচারীর দল হতভম্ব হয়ে গেল।

নোৎরদাম্ গির্জার মধ্যে কোন অপরাধী আশ্রয় গ্রহণ করলে তখনকার আইনানুযায়ী একমাত্র পার্লামেন্ট ছাড়া আর কারও সেখানে তার গায় হাত দেবার অধিকার ছিল না। রাজাদেশ সেখানে

অচল, তা অপরাধীর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারত না। তাই নোৎরদাম্ গির্জা ছিল অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল—স্যাংচুয়ারি।

কোয়াসিমোদো মেয়েটিকে সন্তর্পণে ধরে গির্জার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে তাকে দেখা গেল, মাঝে মাঝে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোয়াসিমোদো উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে লাগল। তারপর সর্বোচ্চ টাওয়ারে উঠে একই স্বরে চিৎকার করতে লাগল—"স্যাংচুয়ারি। স্যাংচুয়ারি।"

এসমেরেলদা তখনও তার হাতে একই ভাবে ধরা।

নীচে জনতাও উত্তরে চিৎকার করে উঠল—"স্যাংচুয়ারি। স্যাংচুয়ারি।"

তাদের সেই চিৎকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হল।

॥ ২৭ ॥

কোয়াসিমোদো যখন এস্‌মেরেলদাকে প্রহরীদের হাত থেকে কেড়ে নেয়, ক্লঁদ ফ্রোলো তখন গির্জায় ছিলেন না।

এসমেরেলদার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবার পরই তিনি ধর্মযাজকের সব পোশাক এক রকম ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং পিছনের দরজা দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে গির্জা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নদীর ওপারে যাবার জন্য তিনি একটা নৌকা ভাড়া করলেন, এবং সেখানে তিনি পাগলের মত অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মন তখন অনুতাপের আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। সেই হতভাগ্য বেদের মেয়েটির কথা তিনি কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিলেন না। ভাগ্যের কি পরিহাস!

যাকে তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, তিনিই তাঁকে মৃত্যুর মুখে

ঠেলে দিয়েছেন। আর হতভাগিনী ফিবাস্, ফিবাস্, করেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। অথচ ফিবাস্ দিব্যি আরামে আছে! ভাবী বধূকে নিয়ে আনন্দ করছে।

তাঁর নিজের উপর আক্রোশে তাঁর নিজের চুলই ছেঁড়বার ইচ্ছা হল। তিনি কি ছিলেন, কি হয়েছেন! কি চেয়েছিলেন, আর কি করলেন!

এতক্ষণে হয়ত এস্মেরেলদার সব শেষ! তার দুটি মূর্তি বার বার তাঁর মনের পটে ভাসতে লাগল। প্রথম দিনে দেখা তার হাস্যময়ী লাস্যময়ী লাবণ্যময়ী নৃত্যরতা অপরূপ সৌন্দর্যমূর্তি। আর আজ দুপুরের শেষ দেখা তার শুষ্ক, বিশীর্ণ, বিমলিন প্রেতমূর্তি। তিনি কল্পনায় দেখতে পেলেন, এস্মেরেলদা কম্পিত পদে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সুকোমল গ্রীবা, যার স্পর্শ পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন, ফাঁসির রজ্জুর আলিঙ্গনে তা হিমশীতল কঠিন হয়ে উঠেছে।

এভাবে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। এ তো শুধু ঘুরে বেড়ান নয়, এ যেন সমাজ, সংসার—এমন কি নিজের কাছ থেকেও আত্মগোপনের আপ্রাণ চেষ্টা!

এইভাবে সন্ধ্যা হল, রাত হল, তখন তাঁর গির্জায় ফেরবার কথা মনে পড়ল। তিনি ধীরে ধীরে আবার নদীর দিকে চললেন। আবার একটি নৌকা ভাড়া করলেন।

নদীর নিস্তরঙ্গ জলে দাঁড়ের একটানা শব্দে ও সন্ধ্যার শীতল বাতাসে তাঁর ক্লান্ত স্নায়ু একটু স্নিগ্ধ হল। নৌকাটি তীরে ভিড়লে তিনি নেমে অন্ধকারে পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু কোন্ পথে যাচ্ছেন, কোথায় যাবেন, তা যেন বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মনের মধ্যে আবার ঝড় বইতে শুরু করল।

এমন সময় হঠাৎ এক বাড়ির জানালার দিকে নজর পড়তে তিনি দেখলেন, তাঁর ভাই জেঁহা একটি পথের মেয়েকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে। অন্য সময় হলে তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, ভাইকে তিরস্কার

করতেন। আজ আর তা করলেন না। করবার ইচ্ছেও হল না। বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর জেঁহা ঘর থেকে বার হয়ে এল। তাঁকে দেখে পাছে সে লজ্জা পায়, তাই তিনি পথের একপাশে শুয়ে পড়লেন। জেঁহা হাঁটতে হাঁটতে তাঁর কাছে এল, তাঁকে দেখল, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তাঁকে চিনতে পারল না। একটা পথের মাতাল ভেবে তাঁকে একটা লাথি মেরে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নোৎরদামের পথ ধরলেন। অদূরে গির্জার উঁচু টাওয়ার দেখা যাচ্ছিল।

গির্জার একটি চাবি সর্বদাই তিনি নিজের কাছে রাখতেন। তাই দিয়ে তিনি পিছনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। গির্জায় তখন প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। মৃদু আলোয় রৌপ্য ক্রুশদণ্ডটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দ্বিপ্রহরের সেই নির্মম অনুষ্ঠানের কিছু কিছু চিহ্ন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে।

তাঁর মনে আবার ভাবান্তর হল। তিনি চারদিকে নানা বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। ভয়ে তিনি চোখ বুজলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। তাঁর মনে হতে লাগল, গির্জার সমস্ত থাম, সমস্ত মূর্তি, এমন কি সমস্ত গির্জাটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাঁকে যেন গ্রাস করতে আসছে!

এই উন্মত্ত মনোভাব, এই অস্থির চিত্ত নিয়ে তিনি গির্জায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষে এক কোণে এক ক্ষীণ দীপালোক দেখে তাঁর ভয়ার্ত হৃদয়ে যেন একটু সাহসের সঞ্চার হল। গির্জার রীতি অনুযায়ী সেখানে একটি বাইবেল রাখা ছিল। পথের লোক যাতে রাতেও তা পড়তে পারে, সেজন্য একটি প্রদীপ সেখানে সারারাত জ্বলত। সে প্রদীপটি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া নিষেধ ছিল।

কিন্তু তখন তাঁর হিতাহিতজ্ঞান ছিল না। তিনি প্রদীপটি তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। এমন সময় গির্জার

ঘড়িতে বারোটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতিপটে দুপুরের চিত্রটি ভেসে উঠল। হতভাগিনী এস্‌মেরেলদা! কখন তার জীবনদীপ নিভে গেছে!

এমন সময় একটা দমকা হাওয়ায় তাঁর হাতের আলোটি নিভে গেল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তখন দেখলেন, তাঁর সামনে একটি ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে মূর্তি নারীমূর্তি॥ এস্‌মেরেলদার মূর্তি। তার মুখ রক্তশূন্য, কাঁধের উপর দীর্ঘ চুল বিলম্বিত, কিন্তু গ্রীবায় ফাঁসির দড়ি নেই, হাতেও কোন বাঁধন নেই। সে এখন মৃত, সে এখন মুক্ত। তার মাথায় একটি ওড়না, পরনে সাদা পোশাক। সে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে, পিছনে তার সেই ভৌতিক ছাগল।

ভয়ে তিনি কাঠ হয়ে গেলেন। তাঁর পা যেন পাথর হয়ে গেল। অনেক কষ্টে এক পা এক পা করে তিনি পিছু হটতে লাগলেন। ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল, তারপর মিলিয়ে গেল।

তিনি আস্তে আস্তে আবার নীচে নামতে লাগলেন।

॥ ২৮ ॥

আশ্রয়প্রার্থী অপরাধীদের জন্য গির্জার উপরতলায় একটি কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল। সেখান থেকে উপাসনার বেদী দেখা যেত।

শ্রান্ত ক্লান্ত কোয়াসিমোদো এস্‌মেরেলদাকে সেই কক্ষের মধ্যে শুইয়ে দিল। এস্‌মেরেলদার তখন সম্পূর্ণ চৈতন্য ছিল না। শুধু এইটুকু বোধই তার ছিল যে, সে যেন শূন্যে উড়ে যাচ্ছে, কেউ যেন তাকে পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে সে চোখ মেলেনি, কিছু দেখতে পায়নি। একবার ভাবল, তার ফাঁসি হয়েছে, সেই কুৎসিত দৈত্যটাই তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়েছে।

কিন্তু কোয়াসিমোদো যখন তাকে সেই কক্ষে শুইয়ে দিয়ে তার হাতের বাঁধন ও গলার ফাঁস খুলে দিতে লাগল, তখন সে যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেল। সে দেখল সে এখন নোৎরদাম্ গির্জার ভিতরে। তার মনে পড়ল, কোয়াসিমোদো তাকে ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করেছে, সে বেঁচে আছে। আর ফিবাস্‌ও বেঁচে আছে, তবে সে এখন অন্য নারীর প্রেমে তন্ময়।

ফিবাসের চিন্তাই তার মনকে পীড়া দিতে লাগল। কোয়াসিমোদোর কুৎসিত আকৃতিও তার অসহ্য মনে হল। তাই সে তিক্ত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমায় বাঁচাতে গেলে কেন?"

কোয়াসিমোদো বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না। এস্‌মেরেলদা আবার সেই একই প্রশ্ন করল। তারও কোন উত্তর মিলল না। কোয়াসিমোদো শুধু আর একবার তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

খানিক বাদেই আবার ফিরে এল।

তার এক হাতে একটা ঝুড়ি, আর এক হাতে একটা বিছানা। ঝুড়ির মধ্যে কিছু রুটি ও অন্যান্য খাবার ও এক বোতল জল। ঝুড়িটি মেঝের উপর রেখে সে বলল, "এতে তোমার খাবার আছে।"

বিছানাটা মেঝেতে পেতে দিয়ে বলল, "এর উপর ঘুমিয়ো।"

এই খাবার, এই বিছানা কোয়াসিমোদোর।

এস্‌মেরেলদা তার এই সহৃদয়তার দরুণ ধন্যবাদ দেবার জন্য তার মুখের দিকে তাকাতে গেল, কিন্তু পারল না। এই কুৎসিত কদাকার চেহারা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। তাই সে নতনয়নে দাঁড়িয়ে মনে মনে অসহায় বোধ করতে লাগল।

কোয়াসিমোদো হয়ত তা বুঝতে পারল। বলল, "আমায় দেখে তুমি হয়ত ভয় পাচ্ছ! আমি কুৎসিত, আমি কদাকার। আমার দিকে তুমি চেয়ো না। শুধু আমার কথা শুনে যাবে। দিনের বেলায় এই ঘর ছেড়ে কোথাও তুমি যাবে না। রাতে তুমি সারা

গির্জা ঘুরে বেড়াতে পার। কিন্তু ভুলেও কোন সময় গির্জার বাইরে পা দেবে না। তাহলে তোমারও মৃত্যু, আমারও তাই।”

কোয়াসিমোদোর এই করুণ কণ্ঠ এস্মেরেল্দার অন্তর স্পর্শ করল। সে তার উত্তর দিতে গিয়ে দেখল, কোয়াসিমোদো সেখানে নেই। চলে গেছে। সেই কক্ষে সে একা।

এই নির্জন কক্ষের নিঃসঙ্গতা যখন তার মনকে পীড়া দিচ্ছিল, তখন সে কার কোমল স্পর্শ অনুভব করল। দেখল, জালি তার পায় মুখ ঘষছে। তাকে আদর করে সে বলল, “তোর কথা আমি একদম ভুলে গেছিলাম। কিন্তু তুই আমায় ভুলিসনি। দেখছি, তুই আমার মত এমন অকৃতজ্ঞ নোস্।”

এই বলে সে কাঁদতে লাগল। সেই বিগলিত অশ্রুধারার সাথে তার হৃদয়ের পাষাণভারও যেন হালকা হল। যখন রাত হল, মনে হল, রাতটি বড় সুন্দর। চাঁদের আলো বড় মধুর। সে তার নিঃসঙ্গতা ভুলবার জন্য গির্জায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই সময়ই ক্ল্যদ ফ্রোলো তাকে দেখেছিলেন, এবং তাকে তার ছায়ামূর্তি ভেবে মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন।

।২৯।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই তার মনে পড়ল, কাল রাতে সে ঘুমুতে পেরেছে। সে একটু অবাক হল। কারণ বহুদিন যাবৎ তার চোখে এক ফোঁটা ঘুম ছিল না।

প্রভাত রবির স্নিগ্ধ কিরণ জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছে। সেদিকে চোখ পড়তেই সে দেখল, কোয়াসিমোদো তার দিকেই চেয়ে আছে। অনিচ্ছায় তার চোখ বুজে এল।

কোয়াসিমোদো তখন তার স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে বলল, “ভয় পেয়ো না। আমি তোমার বন্ধু। তুমি যখন ঘুমুচ্ছিলে, আমি

তখন তোমায় দেখতে এসেছিলাম। এতে তোমার কোন ক্ষতি হয়নি। তুমি যখন চোখ বুজে থাক, তখন আমি এলে আমাকে তো আর দেখতে পাও না। আমি চলে যাচ্ছি। এবার তুমি চোখ খুলতে পার।"

কোয়াসিমোদোর এই করুণ সুরে এস্‌মেরেলদার মন গলে গেল। সে তার মনের অস্বস্তি ও বিরক্তি জোর করে দূর করে, তাকে তার কাছে আসতে বলল। কোয়াসিমোদো ভাবল, সে বুঝি তাকে সরে যেতে বলছে। তাই সে সেখান থেকে চলে যেতে লাগল।

এস্‌মেরেলদা তখন ছুটে গিয়ে তার হাত ধরল। সেই করস্পর্শে তার সমস্ত হৃদয় নেচে উঠল। তার মন আনন্দে ভরে গেল।

এস্‌মেরেলদা তাকে তার ঘরের ভিতর নেবার চেষ্টা করতেই সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "না না, ভেতরে যেতে নেই। প্যাঁচার কোন দিনই কোকিলের বাসায় যাওয়া উচিত নয়।"

এস্‌মেরেলদা তার বিছানায় বসল। কোয়াসিমোদো দরজায় ঠেস দিয়ে একটু হেলে দাঁড়িয়ে বলল, "তাহলে তুমি আমায় আসতে বলছ?"

এস্‌মেরেলদা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

কোয়াসিমোদো যেন সে কথা বুঝতে পারল। একটু ইতস্তত: করে বলল, "তুমি হয়ত জান না, আমি কানে শুনতে পাই না।"

"আহা, বেচারা!" এস্‌মেরেলদার কণ্ঠে সমবেদনার সুর।

"আমি কুৎসিত, এক চোখ নেই, পিঠে কুঁজ, আমি খুঁড়িয়ে চলি। কাজেই কানেও আমার কালা হওয়া উচিত। এই তুমি ভাবছিলে। কি বল?"

তার মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হয়েছিল। তাই উত্তর না পেয়েও আবার বলতে লাগল "আমি জানি, আমি কুৎসিত। কিন্তু এত যে কুৎসিত, তা তোমাকে দেখবার আগে বুঝতে পারিনি। তোমার সাথে আমার যখন তুলনা করি, তখন আমারই আমার উপর ঘৃণা হয়। মনে হয়, আমি তো একটা পশু, পশু ছাড়া তুমি

আমাকে আর কি ভাববে? কারণ তুমি সূর্যের সোনালী কিরণ, প্রভাতের শিশিরবিন্দু, পাখির মধুর কাকলি। আর আমি? আমি না-মানুষ না-পশু। পথের পাশে যে নুড়ি পড়ে থাকে, আমি তার চেয়েও অধম।”

বলতে বলতে সে হেসে উঠল। সে তো হাসি নয়, যেন বুকফাটা কান্না! সে আবার বলল, “হ্যাঁ আমি বধির, কানে শুনতে পাই না। তুমি ইশারায় আমার সাথে কথা বলবে। আমার মনিবও তাই করেন। আমি তোমার ঠোঁটের ভঙ্গী, চোখের ভাব দেখে তোমার কথা বুঝতে পারব।”

“তবে বল, তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?”

“বুঝতে পেরেছি। তোমায় কেন বাঁচালাম, তাই জানতে চাও? তুমি হয়ত ভুলে গেছ, এক রাতে এক শয়তান তোমাকে চুরি করতে চেয়েছিল, তার পরদিন সেই শয়তান যখন পিলোরিতে জলতৃষ্ণায় বুক ফেটে মরছিল, তুমিই তখন মূর্তিমতী করুণার মত তাঁর মুখে জলের বোতল তুলে ধরেছিল। আমার জীবন দিয়েও সে করুণার ঋণ শোধ করা যাবে না। তুমি সেই হতভাগ্যকে ভুলে গেছ, কিন্তু আমি তোমার কথা ভুলতে পারিনি।”

এস্‌মেরেলদা স্তব্ধ হয়ে তার কথা শুনছিল।

কোয়াসিমোদোর চোখে তখন জল। সে আবার বলল, “এই গির্জার টাওয়ার এত উঁচু যে, এখান থেকে লাফিয়ে পড়লে, মৃত্যু অবধারিত। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আমি ওখান থেকে লাফিয়ে পড়তেও দ্বিধা করব না। সেজন্য তোমার মুখের কথাও খসাতে হবে না, তোমার একটু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।”

কোয়াসিমোদো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এস্‌মেরেলদা তাকে বসতে বলল। কিন্তু সে বসল না। বলল, “এখানে আমার আর থাকা ঠিক হবে না। আমি জানি, আমার উপর দয়া দেখাবার জন্যই তুমি তোমার চোখ দুটি মেলে আছ, আমার এ চেহারা দেখতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার এ অস্বস্তি আমি সইতে পারছি না।

তাই আমি চলে যাচ্ছি। দূর থেকে আমি তোমায় দেখব, অথচ তোমার আমাকে দেখতে হবে না।"

এই বলে তার পকেট থেকে একটা পিতলের বাঁশি বের করে এস্‌মেরেলদার হাতে দিয়ে বলল, "যখন তোমার ইচ্ছা হবে, আমাকে দেখে ভয় পাবে না, এমন যখন বুঝবে, তখন এই বাঁশিটি বাজিও। আমি তখনই তোমার কাছে আসব। এই বাঁশির স্বর আমি শুনতে পাই।" এই বলে সে চলে গেল।

। ৩০ ।

দিন কয়েক পর ক্ল্যঁদ ফ্রোলো জানতে পারলেন, এস্‌মেরেলদার ফাঁসি হয়নি। কোয়াসিমোদো তাকে বাঁচিয়েছে। আর সে এই নোৎরদাম্ গির্জায়ই আছে।

এই খবর পাওয়ার পর তিনি আবার তাঁর সেই নিভৃত কক্ষে আত্মগোপন করলেন। উপাসনায় যোগ দেওয়া থেকে গির্জার কোন কাজেই আর তাঁকে দেখা যেত না। তাঁর সে ঘরে যাবার কারও অধিকার রইল না, এমন কি স্বয়ং বিশপেরও নয়।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। সবাই ভাবল, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সত্যই তিনি অসুস্থ। তবে সে অসুখ দেহের নয়, মনের। তিনি মনের সাথে যুদ্ধ করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করছিলেন।

তাঁর সেই কক্ষ থেকে তিনি এস্‌মেরেলদার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে কোয়াসিমোদোকে সেখানে দেখতে পেতেন। এস্‌মেরেলদার প্রতি তার এই বশ্যতা, এই বিনম্র ভাব, এই সহৃদয় ব্যবহার তাঁর মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করল। তবে কি কোয়াসিমোদোও তার প্রতি অনুরক্ত? এস্‌মেরেলদাও কি তাই? ফিবাসের প্রতি তার অনুরাগ না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে এই পশুটাকেও সইতে হবে!

এই ঈর্ষ্যার আগুনে তিনি জ্বলতে লাগলেন। তাঁর দিনের শান্তি রাতের ঘুম দূর হয়ে গেল।

এক রাতে তিনি এস্মেরেলদার কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। তাঁর পরিধানে কৃষ্ণ বাস, হাতে একটি প্রদীপ।

এস্মেরেলদা তখন তার ঘরে ঘুমে অচেতন। ঘুমের মধ্যে সে ফিবাসের স্বপ্ন দেখছে। এমন সময় একটা মৃদু শব্দে তার পাতলা ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ মেলে উঠে বসল। নিশীথ রাতের সেই গভীর অন্ধকারে সে তার বাতায়নপথে দেখতে পেল একখানি মুখ। প্রদীপের মৃদু আলোকে সে মুখের ঈষৎ আভাস মাত্র দেখা যাচ্ছে। এস্মেরেলদা তাঁকে দেখতে পেয়েছে বুঝতে পেরে ক্ল'দ ফ্রোলো ফুঁ দিয়ে আলোটি নিবিয়ে দিলেন। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এস্মেরেলদা যেটুকু দেখতে পেয়েছিল, তাই যথেষ্ট।

আবার সেই শয়তান, সেই ধর্মযাজক! এখানেও তার উৎপাত! এস্মেরেলদা আতঙ্কে শিউরে উঠল। সে ভয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরমুহূর্তেই ক্লঁদ ফ্রোলো ঘরে ঢুকলেন এবং এস্মেরেলদাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। এস্মেরেলদা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ক্লঁদ ফ্রোলোও তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দু বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এস্মেরেলদা চিৎকার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হল না। ক্লঁদ ফ্রোলো বজ্রমুষ্টিতে তার গলা চেপে ধরেছেন। সে গোঁ-গোঁ করে বলতে লাগল, "দূর হ' শয়তান! খুনে বদমাশ!"

রাগে ভয়ে সে থরথর করে কাঁপছিল।

দুজনের ধস্তাধস্তি চলতে লাগল। এর মধ্যে এক সময় হঠাৎ পিতলের বাঁশিটির উপর এস্মেরেলদার হাত পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় তার মুখ থেকে ক্লঁদ ফ্রোলোর হাত সরিয়ে সজোরে বাঁশিতে ফুঁ দিল।

বাঁশির শব্দে ক্লঁ্যদ ফ্রোলো চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন, একটি সুদৃঢ় বাহুর বন্ধনে তিনি দৃঢ়বদ্ধ। কে যে তাঁকে এমনভাবে ধরেছে, অন্ধকারে তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। যেই ধরুক, তিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেন, রাগে তার দাঁত কড়মড় করছে। তার আর এক হাতে একখানি ধারালো ছোরা সেই অন্ধকারেও এক এক বার চকচক করে উঠছে।

অনুমানে বুঝলেন, এ কোয়াসিমোদো ছাড়া আর কেউ নয়। তিনি চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি ভুলে গেলেন, বধির কোয়াসিমোদোর কানে এ চিৎকার প্রবেশ করবে না।

কোয়াসিমোদো তাঁকে মেঝেতে ফেলে তাঁর বুকের উপর চড়ে বসল। তিনি জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। কি করে তিনি কোয়াসিমোদোকে বুঝাবেন, তিনি কে!

এস্‌মেরেলদা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগল। কোয়াসিমোদোর হাতের ছুরি ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর বুকে এই বুঝি বিঁধে গেল!

কিন্তু কোয়াসিমোদোর উদ্যত ছোরা তার হাতেই রইল। সে ভাবল, এস্‌মেরেলদার ঘরে এই রক্তপাত সমীচীন হবে না। এই ভেবে সে ক্লঁ্যদ ফ্রোলোকে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় আকাশে চাঁদও উঁকি মারল। সেই স্বল্পালোকে কোয়াসিমোদো দেখল, আততায়ী ক্লঁ্যদ ফ্রোলো। তাকেই সে ধরে এনেছে। তৎক্ষণাৎ তার মনে আতঙ্ক দেখা দিল, তার হাতের মুষ্টি শিথিল হল।

এস্‌মেরেলদাও দোর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। সে সবিস্ময়ে দেখল, ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর সেই ভয়ার্ত চেহারা আর নেই। তখন তাঁর দৃপ্ত ভাব। কোয়াসিমোদোই অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে। মুহূর্তে যেন পট পরিবর্তন হয়ে গেল। অথচ তার কারণ কি, সে তা বুঝতে পারল না।

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো কোয়াসিমোদোকে চলে যেতে ইশারা করলেন। কিন্তু সে তা গ্রাহ্য না করে এস্মেরেলদাকে এক ধাক্কায় ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়ে দোরগোড়ায় বসে পড়ল। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "আগে আমাকে বধ করুন। তারপর যা ইচ্ছে হয় করবেন।"

এই বলে তার ছোরাখানি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল।

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো তখন বেপরোয়া। তিনি ছোরাখানি নিতে গেলেন। কিন্তু বাধা পড়ল। চকিতে এস্মেরেলদা সেটা কোয়াসিমোদোর হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর ক্লঁ্যদ ফ্রোলোকে উদ্দেশ করে বলল, "যদি সাহস থাকে তবে এগিয়ে এসো। মিথ্যেবাদী, কাপুরুষ! আমি জানি ফিবাসের মৃত্যু হয়নি।"

সে জানত, তার এই কথায় ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর অন্তর্জ্বালা বেড়ে যাবে।

ক্লঁ্যদ ফ্রোলো কোয়াসিমোদোকে সজোরে একটা লাথি মেরে রাগে গরগর করতে করতে তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

॥ ৩১ ॥

গ্রীঁগোয়ারও শুনেছিল, এস্মেরেলদার ফাঁসি হয়নি। নোৎরদাম্ গির্জায় সে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু কোন দিনই তার খোঁজ নেয়নি, সে ইচ্ছাই তার হয়নি।

সেদিন সে একটি গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে তার ভাস্কর্য খুঁটে খুঁটে দেখছিল। এমন সময় ক্লঁ্যদ ফ্রোলো এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

দুজনে অনেক দিন পর দেখা। গ্রীঁগোয়ার দেখল, ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর সে চেহারা নেই। তাঁর মুখ শুকনো, চোখ কোটরে বসে গেছে, চুল কটি সব সাদা হয়ে গেছে।

ক্লঁ্যদ ফ্রোলোই প্রথম প্রশ্ন করলেন, "এখানে কি করছ?"

"দেখতেই পাচ্ছেন, এই গির্জাটির ভাস্কর্য দেখছি।"

"তা হলে ভালোই আছ ?"

"মন্দ কি ! সব ছেড়ে এখন এই পাথরের প্রেমে ডুবে আছি।"

"তোমার মনে তা হলে কোন দুঃখ নেই ? অভাবও নেই ?"

"অভাব হয়ত আছে। কিন্তু দুঃখ নেই। আমার জীবনকে আমার মত করেই গড়ে তুলেছি।"

"কিন্তু মানুষ একভাবে গড়ে, বিধাতা তা অন্যভাবে ভাঙ্গেন।"

"তা হয়ত ভাঙ্গেন। তাতে আর আমার কি ?"

এমন সময় সেপথ দিয়ে একদল অশ্বারোহী সৈন্য মার্চ করে-চলে গেল। গ্রীঁগোয়ার তাদের একজনকে দেখিয়ে বলল, "এই সেনা-পুরুষটিকে আপনার কেমন লাগে ?"

"আমি তাকে চিনি। তার নাম ক্যাপটেন ফিবাস্।"

"এই ফিবাস্। আমি একটি মেয়েকে জানতাম, যে সর্বদা এই নামটি জপ করত।"

"এদিকে এসো। তোমার সাথে আমার কথা আছে।"

এই বলে ক্লঁদ ফ্রোলো তাকে পথের একপাশে টেনে নিয়ে বললেন, "তোমার সেই বেদে মেয়েটির খবর কি ? যে নেচে বেড়াত।"

"এস্মেরেলদার কথা বলছেন ? আপনি দেখছি চট্ করে এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে যেতে পারেন।"

"তাকে তো তুমি বিয়ে করেছিলে ?"

"সে তো কলসীভাঙ্গা বিয়ে।···আমি দেখছি, আপনি এখনও তার কথা মনে রেখেছেন !"

"তার কথা কি তোমার মনে হয় না ?"

"মাঝে মাঝে হয়। বেশী ভাববার সময় কোথায় ?"

"সেই মেয়েটিই তো তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ! শুনলাম তার ফাঁসি হয়নি। সে নোৎরদাম্ গির্জায় আছে।"

"ঠিকই শুনেছ। তবে তিন দিনের মধ্যে পার্লামেণ্টের আদেশে তার ফাঁসির ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"খুবই দুঃসংবাদ। কার এমন মাথা ব্যথা হল যে, এজন্য পার্লামেণ্ট পর্যন্ত ছুটে গেল ?"

"সংসারে শয়তানের আর অভাব কি ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, "কিন্তু ইচ্ছে করলেই তুমি তাকে বাঁচাতে পার।"

"তবে তো রাজা একাদশ লুইএর কাছে তার জীবন ভিক্ষা করতে হয়।"

"রাজা লুইয়ের কাছে জীবনভিক্ষা ! তার চেয়ে বরং বাঘের মুখ থেকে মাংস আনার চেষ্টা করতে পার।"

"তবে ?"

"যেমন করে হোক্, তাকে নোৎরদাম গির্জা থেকে সরাতে হবে। পার্লামেণ্টের আদেশ তিন দিনের মধ্যে পালন না করতে পারলে তা বাতিল হয়ে যাবে।"

তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, "কোয়াসিমোদো ! মেয়েদের রুচি কি জঘন্য ?"

পরে আবার গ্রীঁগোয়ারকে বললেন, "শোন, আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। গির্জার উপর দিনরাত সৈন্যদের নজর। যারা ভেতরে যায়, তারাই শুধু বাইরে আসতে পারে। তুমি ভিতরে যাবে, তোমার স্ত্রীর সাথে পোশাক বদল করে তুমি সেখানে থাকবে, আর তোমার স্ত্রী তোমার পোশাকে বেরিয়ে আসবে। ফাঁসি হয়ত তোমার হবে।"

"স্বীকার করতেই হবে, এমন একটা বুদ্ধি আমার মাথায় আসত না।"

"আমার প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার কি মত ? তোমার স্ত্রীর ঋণ তো তোমার শোধ করা উচিত।"

"অনেক ঋণই তো আমি শোধ করতে পারছি না। তা ছাড়া ফাঁসিকাঠে ঝুলতেও আমার তেমন উৎসাহ নেই।"

"তোমার জীবনের উপর এত মায়ার কারণ কি ?"

"সহস্র কারণ। এই বাতাস, এই আকাশ, এই সুন্দর প্রভাত, সন্ধ্যার অন্ধকার, চাঁদের আলো, প্যারীর ভাস্কর্য, আমার ছন্নছাড়া বন্ধুর দল, আমার বই লেখা—আর কত বলব।"

"তোমার এত সব আনন্দের মূলে যে, তার প্রতি কি তোমার কর্তব্য নেই?"

"আপনি দেখছি, আমায় রাজী না করিয়ে ছাড়বেন না। তা ছাড়া ফাঁসি যে আমার হবেই, তারই বা ঠিক কি? তারা যখন দেখবে, একটা মেয়েকে ফাঁসি দিতে গিয়ে একজন জলজ্যান্ত ব্যাটাছেলেকে ধরে এনেছে, তখন ব্যাপারটা বোধ হয় হাসি-তামাশায়ই শেষ হবে।"

"তাহলে রাজী হচ্ছ?"

"যাতে ফাঁসি যেতে হতে পারে, এমন প্রস্তাবে কি করে চট্ করে রাজী হই?"

"তবে চুলোয় যাও।" এই বলে ক্লঁ্যদ ফ্রোলো রাগ করে চলে গেলেন।

গ্রীঁগোয়ার তাঁর পিছু পিছু ছুটল। বলল, "অত রাগ করছেন কেন? শুনুন, আমার মাথায় চমৎকার একটা মতলব এসেছে, তাতে ওরও উদ্ধার হবে, আমার মাথাটাও বাঁচবে।"

"সেটা কি রকম?"

"বেদেরা মোটামুটি লোক মন্দ নয়। মিশরী দল তো তাকে খুবই ভালবাসে। এক কথায় তারা তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। তারা সবাই দল বেঁধে এসে হাঙ্গামা শুরু করবে। তারপর এক ফাঁকে মেয়েটিকে সরাতে হবে। কাল রাতেই এ ব্যবস্থা করা যায়।"

"তোমার মতলবটা আর একটু খুলেই বল না।"

"তবে আসুন, কানে কানে বলি। কে আবার কোন্ দিক দিয়ে শুনে ফেলবে।"

সমস্ত শুনে ক্লঁ্যদ ফ্রোলো বললেন, "প্রস্তাবটা ভালই মনে হচ্ছে। তাহলে কাল আবার দেখা হবে।"

॥ ৩২ ॥

কোর্ট অব্ মিরাকল্‌স্-এর একটা বাড়ি ছিল তাদের সরাইখানা ও প্রমোদ-গৃহ। হইহল্লা আর ভিড় সেখানে লেগেই থাকত।

সেদিন সন্ধ্যায় সরাইখানায় অন্য দিনের চাইতে অনেক বেশী হট্টগোল। চারদিকেই প্রবল উত্তেজনা। সবাই ছুটাছুটি করছে, সবাই কথা বলছে। ছেলে-বুড়ো সবাই সমান উত্তেজিত। সকলেই রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে।

এই বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে তিনটি দল প্রধান। তিনদলের তিনজন দলপতি।—মিশর ও বোহেমিয়ার ডিউক, টিউনিসের রাজা, আর গ্যালিলির সম্রাট্।

এক জায়গায় নানা অস্ত্রের স্তূপ। বন্দুক, বর্শা, বল্লম, তীর, ধনুক, ছোরা, টাঙ্গি, বর্ম, শিরস্ত্রাণ আরও কত কি! যার যা ইচ্ছা, সে তাই নিচ্ছে। টিউনিসের রাজা ক্লোপিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব বিলি-ব্যবস্থা করছে।

দু একজনের রণসজ্জা একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই হয়েছে। হাতে বন্দুক, কোমরে ছোরা, পিঠে তীর ধনুক। কারও হাতে আবার বন্দুক তরবারি দুইই।

এই তিনটি বড় দল ছাড়া আরও কুড়িটি ছোট দলও আছে। তারাও ব্যস্ত। তারাও হাতে এক একটা অস্ত্র তুলে নিচ্ছে।

এর মধ্যে আবার মদ মাংসের শ্রাদ্ধও চলছে।

এক পাশে গ্রীঁগোয়ারই শুধু দার্শনিক গাম্ভীর্য নিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে ব্যস্ততার কোন লক্ষণ নেই।

"সবাই তাড়াতাড়ি কর। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে।" টিউনিসের রাজা ক্লোপিন সবাইকে তাড়া দিল।

একজন তরুণ মত্ত কণ্ঠে বলল, "আমার নাম জেঁহা ফ্রোলো। জীবনে এই প্রথম রণসাজ পরেছি। আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি

আজ এক মহান্ সংকল্প সাধন করতে যাচ্ছি। আমরা বীরের মত গির্জা আক্রমণ করব, দরজা ভাঙ্গব। আমাদের বোনকে ফিরিয়ে আনব, তাকে ফাঁসি থেকে বাঁচাব। বিশপকে পুড়িয়ে মারব। রাজার সৈন্য এসে আমাদের বাধা দেবার আগেই আমরা আমাদের কাজ শেষ করব। আমরা নোৎরদাম্ লুট করব। কোয়াসিমোদোকে ফাঁসিতে লটকাব। ব্যাটা দিন রাত ঘণ্টা বাজিয়ে সবার কান ঝালা-পালা করে।...এক কালে আমরাও বড়লোক ছিলাম। আমাদেরও বাড়িঘর ছিল। আজও আমার দাদা নোৎরদামের আর্চবিশপ। কিন্তু আমার তাতে কি আসে যায়? টাকা চাইলে পাই না। তাই তো আজ আমি এই দলে। আজ আর তাঁর তোয়াক্কা রাখিনে।...এই, এই দিকে একটু মদ দাও। গলাটা ভিজিয়ে নি।"

ইতিমধ্যে অস্ত্র বিতরণ শেষ হয়েছে। ক্লোপিন তখন গ্রাঁগোয়ারের কাছে গিয়ে বলল, "এতক্ষণ ধরে কি ভাবছ?"

গ্রাঁগোয়ার আগুনের কাছে বসেছিল। বলল, "বসে বসে আগুন দেখছিলাম। দেখতে বেশ লাগে। আগুন থেকে যে ফুলকি বেরোয়, তা আমি তন্ময় হয়ে দেখি। এক একটি ফুলকি যেন এক একটা ব্রহ্মাণ্ড।"

"এ তো হল দার্শনিক কথা। কটা বেজেছে খেয়াল আছে তো?"

"জানি না।"

"বেশ যা হোক্। তুমিই কথাটা প্রথম তুললে, বুদ্ধিও তোমার। এখন বলছ, জানো না? যাও, চটপট তৈরী হয়ে নাও।"

তারপর ক্লোপিন মিশরের ডিউকের কাছে গেল। বলল, "আমার মনে হয়, দিনটা আমরা ঠিক বেছে নিতে পারিনি। কেন না একাদশ লুই এখন প্যারীতেই আছেন।"

"সেজন্যই তো আরও তাড়া। আমাদের বোনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।" মিশরের ডিউক উত্তর দিল।

"এই তো বীরের মত কথা। আমরা আমাদের কাজ ঠিকই হাসিল করব। গির্জা থেকে বাধা দেবার কেউ নেই। পাদরীরা তো

এক পাল ভেড়া। আর আমাদের হাতে অস্ত্র। রাজার সৈন্য আসবার আগেই আমাদের কাজ শেষ হবে। মেয়েটা ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবে।”

এই বলে ক্লোপিন বেরিয়ে গেল। খানিক বাদেই ফিরে এসে ঘোষণা করল, “ঠিক বারোটা বেজেছে। এবারে বের হওয়া যাক্।”

ক্লোপিনের মুখে এই কথা শুনে তারা দলে দলে পথে বার হল। চলার সাথে সাথে তাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র ঝনঝন করে বাজতে লাগল।

ক্লোপিন আবার আদেশ দিল, “দল বেঁধে রওনা হও। চার জন চার জন করে চলো। আমাদের গুপ্ত মন্ত্রটি যেন ভুলো না। নোৎরদামে পৌঁছবার আগে কেউ মশাল জ্বালবে না। এগিয়ে চল। এগিয়ে চল।”

॥ ৩৩ ॥

সেই রাতে কোয়াসিমোদোর চোখে ঘুম ছিল না।

গির্জার চারদিক বেশ ভাল করে দেখে শুনে প্রতিটি দরজায় সে তালা লাগিয়ে দিল।

কাল থেকেই সে লক্ষ্য করেছে, কতকগুলি অপরিচিত লোক যখন তখন গির্জার চারিদিকে ঘুরাঘুরি করছে। তাই তার মনে ভয় জন্মেছে, হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটবে। হয়ত এস্‌মেরেলদার অমঙ্গল হবে।

এই আশঙ্কায় সে কালও সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছে, আজও তারই ব্যবস্থা করছে। সে উপরে উঠে তার প্রিয় ঘণ্টা তিনটির—জ্যাকেলিন, মেরী ও থিবোর দিকে সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে উত্তর দিকের সব চেয়ে উঁচু টাওয়ারে উঠে গেল। সেখান থেকে সে সবিস্ময়ে দেখল, অদূরে দলে দলে লোক যেন গির্জার দিকেই আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হল।

ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল।

সে ভয়ে শিউরে উঠল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল তারা এস্‌মেরেলদাকে জোর করে কেড়ে নিতে আসছে। এখন সে কি করবে, তাই ভাবতে লাগল। কারও সাথে পরামর্শ করার উপায় নেই। যা করবার তাকে একাই করতে হবে।

সে কি এস্‌মেরেলদার ঘুম ভাঙ্গাবে? তাকে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে? সে সুযোগ এখন আর কোথায়? বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যেই গির্জার তিন দিক ঘিরে ফেলেছে। পেছনে শীন্ নদী। নৌকা ছাড়া পার হবার উপায় নেই। তবে আর বৃথা তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে লাভ কি? মরবার জন্য জাগবার যথেষ্ট সময় সে নিজেই পাবে।

একমাত্র উপায় বাধা দেওয়া। সে একা। এত লোককে কি করে বাধাই বা দেবে? কিন্তু তা ছাড়া উপায়ই বা কি আছে। বাধাই তাকে দিতে হবে, তার পর যা হবার হবে।

এই স্থির করে সে বিদ্রোহীদের ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে তারা চলাফেরা করছে।

এমন সময় হঠাৎ এক জায়গায় একটি মশাল জ্বলে উঠল। সাথে সাথে আশেপাশে আরও সাত আটটি মশাল জ্বলে উঠল।

সে আলোয় কোয়াসিমোদো স্পষ্ট দেখতে পেল, নীচে নারী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। তারা সবাই উত্তেজিত। সবার হাতেই একটা না একটা অস্ত্র। মশালের আলোয় তাদের কোন কোনটা এক একবার ঝকঝক করে উঠছে।

বিদ্রোহীদের একজন একটা উঁচু পাথরের উপর উঠে বক্তৃতা দিচ্ছে। তার এক হাতে একটা মশাল, আর এক হাতে একটি বর্শা। তার বক্তৃতা শুনে বিদ্রোহীরা দলে দলে ভাগ হয়ে গির্জার তিন দিকে দাঁড়াল।

বিদ্রোহীদের গতিবিধি ভাল করে লক্ষ্য করবার এবং প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করা যায় তা স্থির করবার জন্য কোয়াসিমোদো আলো হাতে নীচে নেমে এল।

এদিকে সুদক্ষ সেনাপতির মত ক্লোপিন তার বাহিনীর এক অংশকে গির্জার প্রধান ফটকের কাছে এমন করে সাজিয়েছে যে, গির্জার ভিতর বার যে কোন দিক থেকে আক্রান্ত হলেও আত্মরক্ষার অসুবিধা হবে না। সে অবশ্য ধরে নিয়েছিল, কোনদিক থেকেই আক্রমণের কোন আশঙ্কা নেই। তবু সাবধানের মার নেই।

প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে ক্লোপিন একটি প্রাচীরের উপর উঠে গির্জার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। তারপর উচ্চস্বরে ঘোষণা করল: "প্যারীর বিশপ মহোদয়! আমি টিউনিসের রাজা আর্গটের যুবরাজ মূর্খদের পোপ, ক্লোপিন এই ঘোষণা করছি। আমাদের বোন এসমেরেলদা ডাকিনীবিদ্যার মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা। সে আপনার গির্জায় আশ্রয় নিয়েছে। আপনি তার নিরাপত্তার জন্য দায়ী। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি, পার্লামেণ্ট তাকে এখান থেকে নিয়ে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। আপনি কোন আপত্তি করেন নি। বরং সম্মতি দিয়েছেন। কাল নাকি তার ফাঁসি হবে। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। আপনার গির্জার মহিমা যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, আমাদের বোনকে রক্ষা করুন। আর আমাদের বোন যদি রক্ষা না পায়, তবে আপনার গির্জাও রক্ষা পাবে না। কাজেই যদি গির্জার মর্যাদা রক্ষা করতে চান, তবে আমাদের বোনকে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। নইলে আমরা জোর করে তাকে কেড়ে নেব। আপনার গির্জা লুট করব। কোন্‌টা আপনি চান, ভেবে দেখুন। আমার এই ঘোষণার সাক্ষীস্বরূপ এইখানে আমাদের পতাকা উত্তোলন করলাম। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।"

এই ঘোষণার কোন কথাই কোয়াসিমোদোর কর্ণে প্রবেশ করল না। সে শুধু দেখল, একজন বিদ্রোহী বক্তার হাতে পতাকাটি তুলে দিল। সে তা দু'টুকরা পাথরের মধ্যে গুঁজে দাঁড় করিয়ে দিল। পতাকাটিও অদ্ভুত। লম্বা একটা কৃষিযন্ত্রের মাথায় এক টুকরা পচা মাংস গাঁথা।

তারপর ক্লোপিন তার বাহিনীকে প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে আদেশ দিল। সে আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হল। জনা ত্রিশেক বৃষস্কন্ধ বিদ্রোহী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তাদের হাতে হাতুড়ি, সাঁড়াশি, কুড়াল ও শাবল। তারা দরজা ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের দেখাদেখি আরও অনেকে তাদের সাহায্য করতে ছুটে গেল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সেই দরজা ভাঙ্গা গেল না।

ক্লোপিন তাদের উৎসাহ দিতে লাগল। বলল, "আরও জোরে আঘাত করো, আরও জোরে।"

এমন সময় বিদ্রোহীদের মধ্যে একটা বিকট আর্তনাদ শুরু হল। ক্লোপিন দেখল, উপর থেকে একটা প্রকাণ্ড কড়িকাঠ পড়ে ডজন-খানেক বিদ্রোহীকে একেবারে নিঃশেষ করেছে। তাছাড়া আরও বহু বিদ্রোহী জখম হয়েছে—কারও হাত, কারও পা, কারও মাথা গেছে। তারা চিৎকার করে পালাচ্ছে। যারা দরজা ভাঙ্গতে গিয়েছিল তারাও পেছিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জায়গাটি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। ক্লোপিন নিজেও একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। এই কড়িকাঠ কোথা হতে কেমন করে পড়ল, কেউ তা ঠিক করতে পারল না। তারা শুধু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাইতে লাগল।

মিশরের ডিউক অনেক ভেবেচিন্তে বলল, "এ নিশ্চয়ই শয়তানের কাজ। এর মধ্যে ভৌতিক রহস্য আছে।"

আর একজন বলল, "কড়িকাঠটি চাঁদের দেশ থেকে তাদের উপর পড়েছে।"

ক্লোপিন বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমরা সবাই বোকা।" কিন্তু সে নিজেও এ রহস্যের কিনারা করতে পারল না। শুধু বলল, "আমার মনে হয়, এ পাদরীদের কাজ। আত্মরক্ষার জন্য তারা এটা আমাদের উপর ফেলেছে। কাজেই দরজা ভাঙো।"

সমস্ত বাহিনা চিৎকার করে উঠল, "দরজা ভাঙো, লুট কর।"

সেই বিকট চিৎকারে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারা জানালা খুলে আলো জেলে কি হচ্ছে দেখবার জন্য মুখ বাড়াল।

ক্লোপিন তখন আদেশ দিল, "জানালা লক্ষ্য করে গুলি চালাও।"

অমনি সমস্ত জানালা বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত আলো নিভে গেল।

ক্লোপিন আবার বলল, "এগিয়ে যাও। দরজা ভাঙ্গো।"

কেউ ভরসা করে এগিয়ে গেল না। সবাই একবার কড়িকাঠের দিকে, একবার গির্জার দিকে চাইতে লাগল।

"যাও, তোমাদের কাজে যাও। দরজা ভাঙ্গো।"

তবু কেউ এক পাও এগিয়ে গেল না।

"কি একটা কড়িকাঠকে এত ভয়! যত সব বীরপুরুষের দল।"

এক বৃদ্ধ বলল, "কড়িকাঠ নয়, ভয় এই দরজাকে। ওটা আগাগোড়া লোহার পাতে মোড়া। সাঁড়াশি দিয়ে ওর কোন ক্ষতি করা যাবে না।"

"তাহলে কি করতে হবে?"

"খুব বড় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে হবে।"

ক্লোপিন তখন বীরদর্পে কড়িকাঠটির দিকে এগিয়ে গেল। একটা পা তার উপর রেখে বলল, "এটা তুলে নাও। এতেই হাতুড়ির কাজ করবে। এজন্যই পাদরীরা এটা আমাদের পাঠিয়েছে।"

তার এই ঠাট্টায় কাজ হল। সবাই মিলে কড়িকাঠটাকে তুলে নিয়ে দরজার গায়ে দমাদ্দম আঘাত করতে লাগল। তাতে গমগম শব্দ হতে লাগল, সমস্ত গির্জাটি যেন এক একবার কেঁপে উঠতে লাগল।

এমন সময় আর এক বিপদ! বড় বড় পাথরের চাঁই বিদ্রোহীদের মাথার উপর পড়তে লাগল।

জেঁহা বলে উঠল, "এ দেখছি আর এক ভুতুড়ে কাণ্ড। থাম ভেঙে পাথর পড়ছে মনে হচ্ছে।"

বহু বিদ্রোহীর মাথা ফাটতে লাগল। কপাল ফেটে গেল। হাত পা ভাঙ্গল। কিন্তু তারা দমল না। তারা সমান আক্রোশে দরজা ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে পাথর বৃষ্টি চলতেই লাগল। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। বিদ্রোহীদের আক্রোশ এতে আরও বেড়ে গেল। তারা আরও জোরে দরজায় ঘা মারতে লাগল।

কড়িকাঠ ফেলা, পাথর ছোঁড়া—সবই কোয়াসিমোদোর কাজ। আক্রমণের প্রথম দিকে সে যখন গ্যালারিতে নেমে আসে, তখন সে একেবারে দিশেহারা। একবার ভাবল, উপরে গিয়ে বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টাটি বাজিয়ে আসে! কিন্তু আবার ভাবল, ততক্ষণে বিদ্রোহীরা যদি দরজা ভেঙে ফেলে। সে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় হঠাৎ তার মনে পড়ল, আজই মিস্ত্রীরা গির্জার মেরামতের কাজ করে গেছে। তখনও পাথর, সীসের পাত, কাঠের বোঝা, কড়িকাঠ অনেক কিছু জড়ো করে রেখে গেছে।

এদিকে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান্। নীচে হাতুড়ির পর হাতুড়ি পড়ছে, সাঁড়াশি দিয়ে দরজার পেরেক খোলার চেষ্টা হচ্ছে। নিরুপায় কোয়াসিমোদো তখন সবচেয়ে বড় কড়িকাঠটি অসুরের শক্তিতে তুলে ধরে নীচে ফেলে দিল। পাক খেয়ে খেয়ে তা গিয়ে বিদ্রোহীদের উপর পড়ল।

ফলে কিছুক্ষণের জন্য আক্রমণ প্রতিহত হল। এই অবসরে কোয়াসিমোদো পাথরের ছোট-বড় চাঁইগুলি রেলিংএর কাছে জড়ো করতে লাগল। বিদ্রোহীরা আবার যখন দরজার উপর আক্রমণ শুরু করল তখন কোয়াসিমোদোও পাথর বৃষ্টি শুরু করল।

তখন তার সে কি মূর্তি! এই মাথা নুইয়ে পাথর ছুড়ছে, পর মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। এই নীচের দিকে তাকাচ্ছে, আবার মাথা তুলছে। তার এই বিকৃত দেহেও যে এত ক্ষিপ্রতা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

এদিকে বিদ্রোহীরাও বেপরোয়া। তাদের প্রচণ্ড আঘাতে সেই বিশাল দরজা চিড় খেল, তার উপর যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ছিল, তা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। দরজার

পাল্লাগুলি আলগা হতে চলল। কিন্তু মোটা লোহার পাতে মোড়া বলে তখনও দরজাটি টিকে রইল।

কোয়াসিমোদো দেখল, এভাবে চললে দরজাটি আর বেশীক্ষণ রক্ষা পাবে না। এমন সময় তার নজরে পড়ল, দুইটি জলনিকাশী নালার মুখ দরজার ঠিক উপরে পড়েছে। পাশেই সীসের পাতগুলিও পড়ে আছে।

তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। নালার মুখে কতকগুলি কাঠ জ্বেলে সীসের পাতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই উত্তাপে সীসে গলে সেই নালা দুটি দিয়ে তরল সীসে জলের মত নীচে পড়তে লাগল।

বিদ্রোহীদের মধ্যে তখন সে কি আর্তনাদ! সেই সীসের স্রোত যার উপর পড়ছে, সে-ই তখন পুড়ে ছাই হচ্ছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকে মারা গেল, অনেকের চোখ কানা হল, মুখ পুড়ল। তারা ভয়ে আতঙ্কে দরজা ছেড়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। কোয়াসিমোদো দ্বিতীয়বার তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করল।

বিদ্রোহীরা তখন উপরের দিকে চেয়ে দেখল, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর সেই আলো-আঁধারে একটি বীভৎস মূর্তি ছুটাছুটি করছে।

তিন দলপতির—মিশর, টিউনিস ও গ্যালিলির পরামর্শ-সভা বসল। ক্লোপিন হতাশার সুরে বলল, "দরজা ভাঙ্গা অসম্ভব।"

"উপরে আগুনের সামনে দিয়ে একটা দৈত্য আনাগোনা করছে, এ তারই কাজ।" মিশরের ডিউক বলল।

"আরে, এ তো সেই ঘণ্টাবাদক! কোয়াসিমোদো! এতগুলি লোক তার কাছে হেরে যাবে? আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে দরজাটা ভাঙতে পারে?"

মিশরের ডিউক তখন সীসের স্রোতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই দিকে তাকিয়ে দরজা ভাঙ্গার কথা ভাবো।"

"তাহলে কি আমরা শুধু মার খেয়েই ফিরব?"

"কোথায় গির্জার সোনাদানা লুট করব, আর এ কি হল!"

"আর একবার চেষ্টা করা যাক্। তবে অন্য ভাবে।"

"কি রকম ?"

"গির্জায় ঢুকবার আর কোন সহজ পথ আছে কিনা, সেটি খুঁজে বার করতে হবে। আমি এ কাজে যাব। আমার সাথে আর কে কে যাবে ?" ক্লোপিন বলল।

এ কথার উত্তর পাবার আগেই আবার বলল, "ভাল কথা, জেঁহাকেও দেখছি না।"

"হয়ত মারা গেছে। অনেকক্ষণ তার হাসি শুনিনি।"

"বড় দুঃখের কথা। আচ্ছা, গ্রীঁগোয়ার কোথায় ?"

"সে তো মাঝপথেই ভেগেছে।"

"বেড়ে মজা তো ! সব শলা-পরামর্শ সে দিল। আর আমাদের বিপদের মুখে ফেলে সে পালাল ! কাপুরুষ কোথাকার !"

এমন সময় দেখা গেল, জেঁহা একটা লম্বা মই কাঁধে বয়ে আনছে।

"এ দিয়ে কি করবে ?" ক্লোপিন জিজ্ঞাসা করল।

"দরজার মাথার উপরে কতকগুলি মূর্তি দেখতে পাচ্ছ ?"

"তা তো পাচ্ছি। কিন্তু এতে কি হবে ?"

"এটা হচ্ছে ফরাসী সম্রাট্দের গ্যালারি। মই দিয়ে ওখানে উঠব। ওখানে একটা দরজা আছে। চাবিও তার গায়েই লাগান থাকে। একবার ওখানে উঠে চাবিটা বাগাতে পারলে আর পায় কে ? তখন অনায়াসে গির্জার ভেতরে যাওয়া যাবে।"

"তাহলে আমিই আগে উঠি।"—ক্লোপিন বলল।

"বা রে ! মই আনলাম আমি। আর তুমি উঠবে আগে ! ওটি হচ্ছে না। তুমি বরং আমার পেছন পেছন এস।"

"আমি কারও পিছনে চলি না।"

"তাহলে আর একটা মইয়ের যোগাড় দেখ।" এই বলে জেঁহা মইটি গির্জার দেওয়ালে লাগাল। তারপর চিৎকার করে বলল, "যাদের ইচ্ছে হয়, আমার পেছন পেছন এসো।"

অনেকেই ছুটোপুটি করে মইএ উঠতে লাগল। জেঁহা সবার আগে। তাই সে-ই প্রথম লাফ দিয়ে গ্যালারিতে পড়ল। তার

দেখাদেখি আর সবাই যখন একে একে লাফ দেবে, ঠিক সেই সময় কোয়াসিমোদো এগিয়ে এল। সে এতক্ষণ এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। মইটি দুহাতে খাড়া করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাথরের উপর ছুড়ে মারল। আর একবার সেখানে রক্তের স্রোত বইল। হাহাকার উঠল। সব কটি মারা গেল।

এবার জেঁহার পালা। সে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোয়াসিমোদোর চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। কোয়াসিমোদো তার বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরে মাথার উপর এক পাক ঘুরিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিল। মাটি পর্যন্ত আর তাকে পৌঁছুতে হল না। একটা মূর্তির সাথে ধাক্কা খেয়ে তার মাথা চৌচির হয়ে গেল। আর সেই মূর্তির সাথেই আটকে থেকে মধ্যপথে ঝুলতে লাগল।

জেঁহার এই মর্মন্তুদ পরিণতিতে সবাই আক্রোশে ফেটে পড়ল। সকলের মুখে তখন এক চিৎকার—"এর প্রতিশোধ চাই। ভাঙ্গো, সব ভাঙ্গো।"

আরও অনেক মই যোগাড় করা হল। আর সেই মই বেয়ে দলে দলে বিদ্রোহীরা উপরে উঠতে লাগল। যাদের কাঠের মই নেই তারা দড়ির মই বানিয়ে নিল। একজনের পিঠে আর একজন, তার পিঠে আর একজন—এ যেন বিরাট এক পিঁপড়ের সারি!

কোয়াসিমোদো ভয় পেল। তার সব আশা নির্মূল হল। এত লোকের সঙ্গে সে একা আর কি করবে? নিরুপায় হয়ে সে ভগবানকে ডাকতে লাগল। তিনি যদি গির্জা রক্ষা করেন, এস্মেরেলদাকে বাঁচান! তার আর সাধ্য নেই।

। ৩৪ ।

রাজা একাদশ লুই তখন প্যারীতেই ছিলেন। সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত রাজকার্যে ব্যস্ত এমন সময় তাঁর কাছে এই বিদ্রোহের খবর পৌঁছল।

যে সংবাদ নিয়ে এসেছিল, রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে?"

"প্যালে ত্য জাস্টিসের বেলিফের বিরুদ্ধে।"

রাজা আগে থেকেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই এ খবরে মনে মনে খুশীই হলেন। বললেন, "বেলিফের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ কি?"

"তিনিই তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

"তাই নাকি! কারা বিদ্রোহ করছে?"

"বিদ্রোহীরা সবাই কোর্ট অব্ মিরাকল্‌স্‌-এর বাসিন্দা। বেলিফকে এরা মানতেই চায় না।"

"বিদ্রোহীদের সংখ্যা কত হবে?"

"হাজার ছয়েকের কম নয়।"

"তারা কি সশস্ত্র?"

"হ্যাঁ, সবার হাতেই মারাত্মক অস্ত্র। আপনি দয়া করে সেনা পাঠাবার আদেশ না দিলে বেলিফের আর রক্ষে নেই। তাঁর ঘরবাড়ি লুট হবে, হয়ত মেরেই ফেলবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাহায্য তো পাঠাতেই হবে। কাল ভোরে সৈন্যরা যাবে।"

"কাল ভোরে! আর আজ রাতেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

"কি আর করা যাবে, এখন তো বেশী সৈন্য নেই।"

এর উপর আর কথা চলে না।

এদিকে দু'জন বিদ্রোহীকে রাজার সামনে হাজির করা হল। রাজা তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর নাম?"

বিদ্রোহী তার নাম বলল।

"কি করিস্ ?"

"ভিক্ষা।"

"বেলিফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিস্ কেন ?"

"আমি এসব কিছু জানি না। শুনলাম, তারা কোথায় লুটতরাজ করতে যাচ্ছে, তাই আমিও জুটে গেলাম।"

তার সঙ্গীকে দেখিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "একে চিনিস্ ?"

"না, কোনদিন আমি একে দেখিনি।"

"আচ্ছা যা। কাল ভোরে তোর ফাঁসি হবে।"

এইবার দ্বিতীয় আসামীর পালা। তাকেও একই প্রশ্ন।

"তোর নাম ?"

"পিয়ারী গ্রীঁগোয়ার।"

"কি করিস ?"

"আমি একজন কবি আর দার্শনিক।"

"তবে তুই এ বিদ্রোহে যোগ দিলি কেন ?"

"না হুজুর! আমি এর মধ্যে ছিলাম না।"

"তবে তোকে ধরে আনল কেন ?"

"আমি ও পথেই যাচ্ছিলাম। ওরা ভুল করে আমাকে ধরে এনেছে। আমি বই লিখি, নাটক রচনা করি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই মাত্র তো বিদ্রোহীটি বলে গেল, সে আমাকে চেনেও না।"

"চুপ কর্।"

"এরও ফাঁসি হবে তো ?" একজন অমাত্য জিজ্ঞাসা করলেন।

এ মারাত্মক কথা শুনে গ্রীঁগোয়ার হাঁটু গেড়ে বসল। তার পর বলতে লাগল, "আপনি মহৎ, আমি অতি ক্ষুদ্র। আমি আপনার রাগেরও যোগ্য নই। আপনি সিংহের মত পরাক্রান্ত, আর আমি শিয়ালেরও অধম। দয়াই তো আপনার ধর্ম। আমায় দয়া করুন, ক্ষমা করুন। আমি গরিব, আমার কাপড়-চোপড় নোংরা। কিন্তু আমি চোর-জোচ্চোর নই, বিদ্রোহী নই। আমি আপনার একজন অনুগত প্রজা।"

এই বলে সে রাজার পায়ে চুমা খেল।

রাজা তার উপর খুশী হলেন। বললেন, "যাঃ, তোকে মার্জনা করা গেল।"

"আপনার জয় হোক্!" বলে গ্রীঁগোয়ার এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেল। পাছে আবার রাজার মত বদলে যায়।

এমন সময় আরও দু'ব্যক্তি রাজার সাথে দেখা করতে এলেন। একজন প্যারীর প্রভোস্ট, আর একজন ক্যাপটেন ফিবাস্। দু'জনের মুখেই উদ্বেগের ছাপ।

"কি সংবাদ ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

"বড় দুঃসংবাদ! একদল লোক আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।"

"আমার বিরুদ্ধে ? বেলিফের বিরুদ্ধে নয় ?"

"না, আপনার বিরুদ্ধে।"

রাজার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি বিস্তৃত সংবাদ জানতে চাইলেন।

"একটা ডাইনীর বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম হয়। সে নোৎরদাম গির্জায় আশ্রয় নিয়েছে। পার্লামেণ্টের আদেশ, তাকে সেখান থেকে ধরে এনে ফাঁসি দিতে হবে। আর বিদ্রোহীরা চায়, তাকে গির্জা থেকে কেড়ে নিতে। তারা নোৎরদাম গির্জা আক্রমণ করেছে। এখনই রাজসৈন্য না পাঠালে তাদের দমন করা যাবে না।"

"আমি ফ্রান্সের রাজা, আমি হচ্ছি নোৎরদাম গির্জার রক্ষক। সেই গির্জা আক্রমণ! তবে তো আমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যাও, সব সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। একজন বিদ্রোহীও যেন জ্যান্ত ফিরে যেতে না পারে। এত দুঃসাহস! আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! যাও, আর এক মুহূর্ত দেরি করো না। সব কটাকে শেষ করে আমাকে খবর দেবে। আজ রাতে আমি আর ঘুমোব না।"

বৃদ্ধ রাজা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন।

"কিন্তু ডাইনীটাকে নিয়ে কি করা হবে ?"

"বিদ্রোহীরা ওকে নিয়ে কি করত ?"

"খুব সম্ভব ফাঁসি দিত।"

"তবে তোমরাও তার ফাঁসি দেবে।"

রাজার এ আদেশ শুনে একজন পারিষদ আর একজনকে চুপে চুপে-বলল, "চমৎকার ব্যবস্থা। বিদ্রোহীরা যা করতে চেয়েছিল, তার জন্য তারা পাবে শাস্তি। এদিকে রাজাও আবার তাই করবেন।"

প্রভোস্ট বললেন, "কিন্তু ডাইনী তো গির্জার ভিতরে। স্যাং-চুয়ারীতে।"

"ওঃ স্যাংচুয়ারী।" বলে রাজা তাঁর টুপি খুলে মেরী মাতাকে উদ্দেশ করে বললেন, "আমায় ক্ষমা করো।"

তার পর প্রভোস্টকে আদেশ দিলেন, "তবুও ওকে ফাঁসিই দিতে হবে। যাও, আর দেরি করো না।"

॥ ৩৫ ॥

রাজার ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে গ্রীঁগোয়ার পাগলা ঘোড়ার মত ছুটতে আরম্ভ করল। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক জায়গায় একজনের সাথে তার দেখা করার কথা। রাজার সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় তার দেরি হয়ে গেছে।

সেখানে পৌঁছতেই দেখে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিটি অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। তার সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা।

গ্রীঁগোয়ার বলল, "আমার দেরি হয়ে গেল।"

"রাত কত হয়েছে জান? দেড়টা। তোমার এত দেরি হল কেন?"

"কি করব বলুন। রাজা আর তার সৈন্যদের জন্যই এত দেরি। আমাকে তো ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল, অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। আমার এমনই ভাগ্য যে, সব হাতের কাছে এসে ফসকে যায়। এমন কি ফাঁসির দড়িও।"

"তোমার সবই ফসকে যায়। সে কথা যাক। চলো আমার সাথে। এমনিই দেরি হয়ে গেছে। বিদ্রোহীদের সংকেত শব্দটি মনে আছে তো ?"

"ভাবুন, স্বয়ং রাজার সাথে দেখা। এই মাত্র তাঁরই কাছ থেকে আসছি। রাজার পরনে ফ্ল্যানেলের ব্রীচেস্। সে যা দেখতে !"

"বাক্যবাগীশ, তোমার বকবকানি থামাও তো। রাজার কি পোশাক তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। বিদ্রোহীদের সংকেত শব্দটি কি তাই বল।"

গ্রীঁগোয়ার সে শব্দটি উচ্চারণ করে শোনাল।

"বেশ এবার চল। বিদ্রোহীরা তো গির্জার পিছন দিকই ঘিরে ফেলেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে তারা বাধা পেয়েছে, লড়তে হচ্ছে। নইলে এতক্ষণে সব তছনছ করে দিত। হোক দেরি, এখনও হয় তো সময়মতই পৌঁছুতে পারব।"

"তা যেন হল। কিন্তু গির্জার ভিতরে কি করে ঢুকব।"

"আমার কাছে টাওয়ারের চাবি আছে।"

"তারপর বেরুবো কি করে ?"

"পিছনের দিকে একটা দরজা আছে। সেটা খুললেই নদী। আমি চাবি যোগাড় করে রেখেছি। একটা নৌকারও ব্যবস্থা করেছি।"

এই বলে তারা দুজনে নোৎরদাম গির্জার দিকে রওনা হল।

এদিকে কোয়াসিমোদো যখন দেখল, পিঁপড়ের সারির মত বিদ্রোহীরা টাওয়ারে উঠছে, তখন সে গির্জা রক্ষার আশা ছেড়ে দিয়ে এস্‌মেরেলদাকে কিভাবে বাঁচানো যায়, সেই চিন্তায়ই অস্থির হয়ে পড়ল।

এমন সময়ে সে দেখল, নীচে হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠেছে। রাজসৈন্য সমস্ত পথ ঘিরে ফেলেছে।

বিদ্রোহীর দলও রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেন ? কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হার মেনে পালাতে শুরু করল।

এতক্ষণ কোয়াসিমোদোর এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম ছিল না। এবার সে হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাল। তিনি তার প্রার্থনা শুনেছেন। সব দিক রক্ষা পেয়েছে।

আনন্দের উত্তেজনায় সে এস্মেরেলদার কক্ষের দিকে ছুটে গেল। গিয়ে দেখে, কক্ষ শূন্য। এস্মেরেলদা নেই।

॥ ৩৬ ॥

ক্লোপিনের বাহিনী যখন গির্জা আক্রমণ করে, এস্মেরেলদা তখন ঘুমে অচেতন। কিন্তু বাইরের গোলমাল এবং তার জালির কাতর চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। কি হচ্ছে দেখবার জন্য সে কক্ষের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

নীচে তখন গোটা কয়েক মশাল জ্বলছে। সেগুলি হাতে নিয়ে কতকগুলি কুৎসিত চেহারার লোক ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করছে। দরজার উপর আঘাতের শব্দ হচ্ছে। উপর থেকে পাথর বৃষ্টি হচ্ছে।

এস্মেরেলদা শিশুকাল থেকে নানা কুসংস্কারের মধ্যে মানুষ। তাই তার মনে হল, প্রেতের দল বুঝি তাণ্ডব শুরু করেছে। আর গির্জার পাথরের মূর্তিগুলি বুঝি জীবন্ত হয়ে তাদের বাধা দিচ্ছে, পাথর ছুড়ছে। অশরীরীদের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখা অন্যায়। এই ভেবে সে আবার তার ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু তার আর ঘুম এল না। জেগে জেগে নানা দুশ্চিন্তায় সময় কাটাতে লাগল। তারপর এক সময় সে তার ঘরের কাছে মানুষের পায়ের শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। দেখা গেল, দুজন লোক এদিকেই আসছে। তাদের একজনের হাতে আলো।

এ দেখে সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

"ভয় পেয়ো না। আমি গ্রীঁগোয়ার।"

গ্রীঁগোয়ারের গলা শুনে তার ভয় দূর হল। সে তখন মুখ তুলে

চাইল। এবং দেখল, সত্যই গ্রীঁগোয়ার তার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার পাশেই আর একটি লোক, কালো পোশাকে তার মুখ পর্যন্ত ঢাকা। তাকে দেখে সে আবার শিউরে উঠল।

"তোমার সাথে ও কে?" এস্মেরেলদা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

"আমার এক বন্ধু।"

ছাগলটি এ সময় লাফাতে লাফাতে গ্রীঁগোয়ারের কাছে আসতেই সে তাকে কোলে তুলে নিল। বলল, "আঃ জালি, তুমি আমাকে ভোলোনি। তোমার ছ'চারটা খেলা দেখাও।"

তার বন্ধু তাকে একটি ধাক্কা দিতেই সে বলল, "আমি ভুলেই গেছিলাম, আমাদের হাতে সময় খুব অল্প।"

তারপর এস্মেরেলদাকে বলল, "তোমার আর জালির, দুয়েরই জীবন বিপন্ন। তারা আবার তোমাদের ফাঁসি দিতে চায়। আমি আর আমার বন্ধু তোমাদের বাঁচাতে এসেছি।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি নয় কি মিথ্যে? তাড়াতাড়ি করো। দেখছো চারদিকে কি গোলমাল। ওরা তোমাদের ধরতে এসেছে।"

"তোমার বন্ধুটি মুখ খুলছে না কেন?"

"ওটা তাঁর অভ্যাস।"

তখনকার মত এই উত্তরেই এস্মেরেলদা সন্তুষ্ট হল।

গ্রীঁগোয়ার তার হাত ধরল। জালিও মনের আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের সাথে চলল।

ধীরে ধীরে তারা নীচে নেমে গির্জার পিছন দিকে গেল। গ্রীঁগোয়ারের বন্ধু নিঃশব্দে দরজাটি খুলল। তারপর তিনজনেই নদীর দিকে চলল। তখনও গির্জার সম্মুখ দিকে গোলমাল চলছে।

একটা ঝোপের আড়ালে আগে থেকেই একটা নৌকা ঠিক করা ছিল। তিনজনেই গিয়ে নৌকায় উঠল। গ্রীঁগোয়ার জালিকে

কোলে নিয়ে বসল। এস্মেরেলদা তার গা ঘেঁষে বসল। গ্রীঁগোয়ারের বন্ধু গলুইতে বসে নিঃশব্দে দাঁড় টানতে লাগল।

নৌকা যখন চলতে শুরু করল, তখন গ্রীঁগোয়ার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যাক বাঁচা গেল।...ভাগ্য আমাদের টেনে নেয় বটে, কিন্তু বুদ্ধি খেলিয়েও অনেক কিছু করা চলে।"

এস্মেরেলদা তার শেষ কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

নৌকা চলতে লাগল! নদীর জলে দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হতে লাগল। প্রতিকূল স্রোতে ধীরে ধীরে উজান বেয়ে চলল।

নদীর স্রোতের মত গ্রীঁগোয়ারের বাক্যস্রোত সমানেই চলতে লাগল। তার মুখের আর বিরাম নেই। কথায় কথায় সে এক সময় তার বন্ধুকে বলল, "কোয়াসিমোদো এক বেচারার মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে। সে গীর্জারই একটা মূর্তির সাথে আটকে ঝুলছে। আমার চোখটা খারাপ। তাই দূর থেকে তার মুখটা ভাল দেখতে পাইনি। আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন। সে কোন্ হতভাগ্য?"

তার বন্ধু কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তার দাঁড় টানা বন্ধ হল। হাত দুটি অবশ হল, মাথাটি নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কান্নার স্বর শুনে এস্মেরেলদা চমকে উঠল। মনে হল, এ স্বর যেন সে এর আগেও শুনেছে।

দাঁড় টানা বন্ধ হওয়ায় নৌকা স্রোতের সাথে চলতে শুরু করেছিল। তার বন্ধু নিজেকে সামলে নিয়ে আবার দাঁড় ধরল।

এস্মেরেলদার মনে ভয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে সর্বক্ষণ সেই দৃষ্টি দিয়ে লোকটির গতিভঙ্গী, হাত-পা নাড়া লক্ষ্য করছিল।

ওদিকে নোৎরদাম গির্জায় গোলমাল, চিৎকার, চেঁচামেচি, দৌড়াদৌড়ি বেড়েই চলল। উপরতলায় টাওয়ারে অনেকগুলি মশালের আলো দেখা গেল। মশালগুলি এদিকওদিক ছুটাছুটি করছে। আর একসঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে—"জিপসী মেয়েটা কোথায়? কোথায় পালাল?"

নৌকা তখনও নোৎরদাম গির্জা থেকে বেশী দূর যেতে পারেনি। কাজেই এস্‌মেরেলদার বুক ভয়ে তুরতুর করতে লাগল। গ্রীঁগোয়ারের বন্ধু নিঃশব্দে দাঁড় টানতে লাগল। গ্রীঁগোয়ারের মনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল।

যদি ধরা পড়ে, তবে শুধু এস্‌মেরেলদার নয়, জালিরও ফাঁসি হবে। দুই-ই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। দুজনের জীবনই এখন তার উপর অনেকটা নির্ভর করছে। কিন্তু দুজনের ভার কি তার পক্ষে বেশী হবে না! তার বন্ধুটি তো এস্‌মেরেলদার ভার পেলে খুশী মনেই সে ভার নেবে। কিন্তু তাতে যে অন্তর সায় দিচ্ছে না। অথচ কাকে রাখবে, কাকে ছাড়বে, স্থিরও করতে পারছে না।

ইত্যবসরে নৌকা কূলে ভিড়ল। নোৎরদামের গোলমাল এ পারেও ভেসে আসছিল।

গ্রীঁগোয়ারের বন্ধু এস্‌মেরেলদার হাত ধরে তাকে নৌকা থেকে নামাতে এগিয়ে এল। কিন্তু সে এক ঝাপটায় তার হাত সরিয়ে দিয়ে গ্রীঁগোয়ারের হাত ধরতে গেল। কিন্তু গ্রীঁগোয়ার তখন জালিকে নিয়েই ব্যস্ত। এস্‌মেরেলদার দিকে নজরও দিল না। অগত্যা সে নিজেই নৌকা থেকে নামল।

তার অশান্ত মনে তখন নানা চিন্তা। সে যে কি করবে, কোথায় যাবে, কিছুই জানা নেই। এরা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে, গ্রীঁগোয়ারের বন্ধুটি কে, যদি বন্ধুই হয়, তবে তার এই অদ্ভুত পোশাক ও অদ্ভুত আচরণ কেন—এমনি নানা চিন্তায় তার মন ভারী হয়ে উঠল। সে হতবুদ্ধির মত নদীর দিকে তাকিয়ে নদীর স্রোত দেখতে লাগল।

তারপর এদিকে যখন মুখ ফেরাল, দেখল, গ্রীঁগোয়ার জালিকে নিয়ে সরে পড়েছে। সেই নির্জন নদীতীরে সে আর অজ্ঞাতপরিচয় গ্রীঁগোয়ারের বন্ধু।

এস্‌মেরেলদা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে কথা বলতে, কাঁদতে, গ্রীঁগোয়ারকে ডাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার স্বর ফুটল না।

লোকটি তার হাত চেপে ধরল। সে মুষ্টি দৃঢ়, কিন্তু হিমশীতল। লোকটি কোন কথা না বলে তাকে নিয়ে চলল। এস্মেরেলদা বুঝল, নিয়তিকে বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই।

নদীর তীর ছেড়ে তারা পথে পড়ল। সে পথও নির্জন। কেবল নদীর ওপারে নোৎরদাম গির্জার গোলমালের খণ্ড খণ্ড শব্দ এপারে ভেসে আসছে—সেও ভয়ঙ্কর শব্দ! এস্মেরেলদা…ডাইনী… খুঁজে বার কর…হত্যা কর।

এক সময়ে একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে জানালায় আলো দেখে এস্মেরেলদা চিৎকার করে উঠল—"আমায় বাঁচাও।"

সে চিৎকারে গৃহস্বামী দোর খুলে আলো হাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন, ঘুম-জড়ানো চোখে দুজনকে দেখলেন, তারপর দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। এস্মেরেলদা বুঝল, তার আর কোন আশা নেই।

লোকটি তখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। সেও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু এভাবে কে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, এত ভয়ের মধ্যেও এটা জানবার কৌতূহল সে আর চেপে রাখতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

লোকটি কোন উত্তর দিল না।

চলতে চলতে তখন তারা এক প্রশস্ত মাঠে এসে পড়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। সে আলোয় এস্মেরেলদা দেখল, অদূরে ক্রুশের মত কি একটা দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে বুঝতে পারল, তারা বধ্যভূমিতে এসেছে, ওটা ফাঁসিকাঠ।

এবার লোকটি তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মুখের ঢাকা ফেলে দিল। এস্মেরেলদা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। ভগ্নস্বরে বলল, "আমি যা ভেবেছিলাম! সেই ধর্মযাজক! সেই শয়তান! সেই খুনে!"

ক্লঁদ ফ্রোলোকে দেখে এস্মেরেলদার মনে হল, প্রেতলোক থেকে একটি প্রেত বুঝি এই বধ্যভূমিতে তার রক্তপান করতে এসেছে: এমনি বিবর্ণ, শুষ্ক চেহারা!

ক্লঁদ ফ্রোলো বললেন, "যা বলি মন দিয়ে শোন। বাধা দিও না।

অন্য দিকে মুখ ফিরিও না।…পার্লামেণ্ট তোমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছে। কালই তোমার ফাঁসি হবে। ওই দেখ মশাল হাতে রাজসৈন্য তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।…ফিবাসের কথা মন থেকে মুছে ফেল। আমার কথায় রাজী হও। তাহলে এখনও আমি তোমায় বাঁচাতে পারব।…হয় আমি, নয় এই ফাঁসি—এই দুয়ের মধ্যে একটা তোমায় বেছে নিতে হবে। বল, কাকে চাও?"

"ফাঁসিকাঠই আমার কাম্য। এখানেই আমার জ্বালা জুড়াবে।" এই বলে সে ছুটে গিয়ে ফাঁসিকাঠটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

"তবে মর।"

॥ ৩৭ ॥

অদূরে টুঁ-রোলা। দুঃখে শোকে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে যারা বাকী জীবন কৃচ্ছ্রসাধনে কাটাতে চায়, কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ভগবানের নাম করতে চায়, জায়গায় জায়গায় তাদের জন্য ছোট ছোট পাথরের ঘর ছিল। সে ঘরে যারা একবার প্রবেশ করে, তাদের আর বেরুবার পথ থাকত না। কারণ ঘরে প্রবেশ করার পরই দরজাটি গেঁথে দেওয়া হত। আলো বাতাস ঢুকবার জন্য থাকত ছোট একটি জানালা। সে ঘরে কোন আসবাবপত্র থাকত না, খাবার কোন ব্যবস্থা থাকত না। যদি দয়া করে জানালা দিয়ে কেউ কিছু দিত, তবে সেদিন খাবার জুটত, নইলে উপবাস। সাধারণতঃ মেয়েরাই এই কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হত।

টুঁ-রোলাও এমনি একটি কক্ষ। একমাত্র কন্যাহারা এক নারী সেখানে বাস করত। পাথরের মেঝেতে কিছু খড়, এই তার শয্যা। একটি বড় পাথর, তাই তার উপাধান।

দীর্ঘ পনর বছর যাবৎ সে সেখানে আছে। এই পনর বছরে তার মধ্যে এসেছে অকালবার্ধক্য। তার পরনে জীর্ণ মলিন পোশাক। মাথার চুল শণের মত সাদা। হিংস্র রুক্ষ ডাইনীর মত চেহারা।

কুড়ি বছর আগে বেদেনীরা তার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায়। আজও সে তাকে ভুলতে পারেনি। তারই শোকের আগুন বুকে জ্বালিয়ে আজ পনর বছর সে নিজেকে এই ঘরে নির্বাসিত করেছে। মনের পটে আঁকা তার সেই শিশুকন্যার ছবি, আর তার ক্ষুদ্র পায়ের এক পাটি জুতা, এই সম্বল নিয়েই সে আছে।

বেদেনীরা তার মেয়েকে চুরি করেছিল বলে তারা ছিল তার দু চোখের বিষ। এস্মেরেলদাকে দেখলেই তার মাথার ঠিক থাকত না। তাকে কেবলই অভিশাপ করত—"মর্, মর্, ফাঁসিকাঠে তোর মরণ হোক্।"

* * * *

ক্লঁ্যদ, ফ্রোলো যখন দেখলেন, এস্মেরেলদাকে পাবার আর কোন আশা নেই, তখন তিনি তাকে টানতে টানতে টুঁ-রোলার কাছে নিয়ে এলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, "বুড়ীমা, একটা বেদের মেয়েকে ধরে এনেছি। এবার তার উপর তোমার প্রতিশোধ নিতে পারবে। আজ তার ফাঁসি হবে।"

এস্মেরেলদা দেখল, জানালা দিয়ে দুখানা শীর্ণ বাহু বেরিয়ে আসছে। যেন দুখানা কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের মুষ্টি যেন বজ্রমুষ্টি। তাই দিয়ে সে এস্মেরেলদার হাত চেপে ধরল। তার মনে হল, তার হাত বুঝি এখনই ভেঙে যাবে।

"বেশ শক্ত করে ধরে থেকো। পালাচ্ছিল, আমি ধরে এনেছি। দেখো, আবার যেন না পালায়। সৈন্যরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের ডেকে আনছি।···তুমি এতদিন যার ফাঁসি চাইছিলে, আজ তার ফাঁসি দেখবে।"

হা হা হা! বৃদ্ধা পিশাচের হাসি হাসল।

এস্মেরেলদা দেখল, ক্লঁ্যদ ফ্রোলো সৈন্যদের খোঁজে গেল। এই বৃদ্ধাকে সে চিরদিনই ভয় করত, আজ তার বজ্রমুষ্টিতে এমন অসহায় হয়ে তার সে ভয় আরও বেড়ে গেল। সে তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল! কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

ব্যর্থশ্রম এস্‌মেরেলদার মনে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখা দিল। জীবনের সমস্ত মাধুর্য, যৌবনের আশা, অনন্ত আকাশ, প্রকৃতির সৌন্দর্য, তার ফিবাস্ সবই তার মন থেকে মুছে গেল। তার মনে তখন ভাসছিল, ক্ল্ঁদ ফ্রোলোর বিশ্বাসঘাতকতা, জল্লাদের করাল মূর্তি, আর অদূরে এই ফাঁসিকাষ্ঠ।

"হা হা হা! তোর ফাঁসি হবে।"—বৃদ্ধার সেই বিকট হাসি যেন তার বুকে গিয়ে বিঁধল।

"আমি তোমার কি করেছি?"

বৃদ্ধা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "কি করেছিস্? তবে শোন্।···আমার একটি মেয়ে ছিল। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। তার নাম অ্যাগনেস্। বেদেনীরা আমার সে মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেল।···এবার বুঝেছিস্, তুই কি করেছিস্?"

"আমি তো তখন জন্মাইও নি।"

"না না, তোর তখন জন্ম হয়েছে। বেঁচে থাকলে আমার মেয়ের আজ তোরই মত বয়স হত, তোরই মত সুন্দর হত। সেই মেয়েকে বেদেনীরা চুরি করেছে, তাকে চিবিয়ে খেয়েছে। এবার আমার পালা। আজ আমি তোকে খাব, বেদেনীর মেয়ের মাথা চিবুব।··· হা হা হা!···বেদেনীর দল, তোরা আমার মেয়েকে খেয়েছিস্। এবার দেখে যা, তোদের মেয়ের কি দশা। আজই তার ফাঁসি হবে। সে মরবে। আমি দেখব।···হা হা হা!"

এদিকে ঊষার আলো ফুটি ফুটি করছে। অদূরে ফাঁসিকাঠটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অশ্বারোহী সৈন্যরাও এদিকেই আসছে।

"বুড়ীমা, ওই ওরা আসছে। আমায় দয়া কর। বাঁচাও! আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি। তবুও তোমার চোখের সামনে আমায় ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, তুমি তাই দেখবে! আমায় ছেড়ে দাও। আমি পালাই।"

"তবে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে।"

"দয়া কর। দয়া কর। আমি এভাবে মরতে পারব না।"

"আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে।"

"ভগবানের দোহাই, আমায় ছেড়ে দাও।"

"আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে।"

"তুমি তোমার মেয়েকে দাও, আর আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার বাবা মাকে।"

"আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে। সে কোথায় আছে বল্। তার এই একপাটি জুতো, শুধু এইটুকু স্মৃতি নিয়েই আমি কুড়ি বছর চোখের জল ফেলছি। বল্ আমার সে মেয়ে কোথায়? যেখানে সে আছে, সেখানেই আমি যাব।"

তখন অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয়ে প্রভাতের অরুণাভা ফুটে উঠেছে। সেই আলোতে বৃদ্ধার হাতের জুতাটি দেখে এস্মেরেলদা চমকে উঠল। তার একটি হাত মুক্ত ছিল। সে সেই হাত দিয়ে তার গলায় ঝুলান থলি থেকে ঠিক একই রকম আর এক পাটি জুতা বার করল। তাতে এক টুকরা কাগজ আঁটা। তাতে লেখা, "এর মত আর এক পাটি জুতা যার কাছে পাবে সেই তোমার মা।"

বৃদ্ধা দুই পাটি জুতাই মিলিয়ে দেখল, লেখাটিও পড়ল। তারপর আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "আমার মেয়ে, আমার অ্যাগনেস্।"

"মা, আমার মা।"

দুজনই আবেগে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। দুজনেরই চোখে জল। দুজনের চোখেই আনন্দের দীপ্তি!

মার প্রাণ তার এতদিন পরে পাওয়া মেয়েকে বুকে নেবার জন্য ফেটে যাচ্ছে। মেয়েও মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু মাঝে দেওয়ালের বাধা।

বৃদ্ধা পাগল হয়ে উঠল। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জানালার গরাদে ভাঙতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেই শীর্ণ শরীরে আর কতটুকু শক্তি! তখন ঘরে যে পাথরখানি ছিল, যার উপর মাথা দিয়ে এতদিন সে শুয়েছে, তাই দিয়ে গরাদেতে আঘাত করতে লাগল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর গরাদেটি ভেঙে গেল। আর বৃদ্ধা সেই ফাঁক দিয়ে মেয়েকে

ঘরের ভিতর টেনে নিল। তারপর তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, চুমো খেয়ে, কোলে নিয়ে তাকে আদর করতে লাগল।

আর বলতে লাগল, "ভগবান্, কে বলে তুমি নিষ্ঠুর। তুমি আমার হারানো মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়েছ! কে বলে জিপসীরা খারাপ, তারা আমার মেয়েকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে।...এত দিন তোকে কত গালমন্দ করেছি, কত শাপমন্যি দিয়েছি, সব ভুলে যা, মা। আমি তোকে ভালবাসব, বুকে করে রাখব!...দেখি, তোর ঘাড়ে সেই তিলটি আছে কিনা। হ্যাঁ, এই তো আছে।...তুই কি সুন্দর, তোর মুখখানা কি মিষ্টি!"

এমন সময় সৈন্যদের কোলাহল শোনা গেল। তারা এদিকেই আসছে। এস্মেরেলদার সব আনন্দ নিমেষে দূর হয়ে গেল। সে মাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল স্বরে কাঁদতে লাগল, "ওরা আমায় ধরতে আসছে। তুই আমায় রক্ষা কর্ মা। আমায় বাঁচা।"

"কি বলছিস মা? কারা ধরবে...? ও আমি তো ভুলেই গেছিলাম। তুই কি করেছিলি মা?"

"জানি না। শুধু এইটুকু জানি, তারা আমার ফাঁসি দেবে। তাই তারা আমায় ধরতে আসছে।"

"তোকে ফাঁসি দেবে? আমার কোল থেকে কেড়ে নেবে? পনর বছর যার অপেক্ষায় এখানে বসে দিন গুনছি, সে আমার কোলে ফিরে আসতে না আসতেই তারা তোকে আবার কেড়ে নেবে? না, না, কিছুতেই তা হতে পারে না।"

সৈন্যরা খুবই কাছে এসে পড়েছে। তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একজন বলছে, "ওদিকে চলুন। ধর্মযাজক বলছেন, টুঁ-রোলাতে ওকে পাওয়া যাবে।"

বৃদ্ধা হতাশায় মুষড়ে পড়ল। "পালা মা, শীগ্‌গির পালিয়ে যা! হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তুই ঠিকই বলেছিস্, ধরতে পারলেই তারা তোকে ফাঁসি দেবে। পালা পালা, পালিয়ে যা।"

কোথায় পালাবে, কি করে পালাবে? চারদিকে সৈন্য। পালাবার

সব পথ বন্ধ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে মেয়েকে বলল, "ওই কোণে চুপটি করে বসে থাক্। যেন টুঁ শব্দটিও না হয়।"

তার চোখ তখন শাবকহারা বাঘিনীর মত জ্বলজ্বল করছে। অস্থিরচিত্তে সে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে নিজের চুল ছিঁড়ছে। আপসোসে বুক জ্বলে যাচ্ছে। কেন সে তাকে আগে ছেড়ে দেয়নি। কেন ধরে রেখেছিল!

সে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। তারপর মেয়েকে বলল, "ভয় নেই। তুই চুপ করে থাক্। আমি ওদের বুঝিয়ে বলব, তুই আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছিস্।"

এই বলে তাকে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখল এবং যাতে তার সাদা গাউন বাইরে থেকে চোখে না পড়ে, সেজন্য তার চুলগুলি চারদিকে ছড়িয়ে দিল।

এমন সময় ক্লঁ্যদ ফ্রোলোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"এই দিকে ক্যাপটেন্ ফিবাস্।"

ফিবাসের নাম শুনে এস্মেরেলদা চঞ্চল হয়ে উঠল। মায়ের নজর এড়াল না। বলল, "চুপ করে থাক্ মা। একটুও নড়বিনে।"

॥ ৩৮ ॥

তার কথা শেষ হতে না হতেই প্রভোস্টের নেতৃত্বে একদল সৈন্য তার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের তরবারির আস্ফালন ও অশ্বক্ষুরের শব্দে সে স্থান উচ্চকিত হয়ে উঠল।

বৃদ্ধাও তাড়াতাড়ি জানালার মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভোস্ট তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে বৃদ্ধাকে বললেন, "আমরা কাল রাত থেকে একটা ডাইনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুনলাম, সে তোমার এখানে আছে।"

"আমার এখানে? তুমি কি বলছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

"তাহলে সেই পাগল আর্চডিকন্ কি বাজে খবর দিল? সে কোথায়?"

একজন সৈন্য উত্তর দিল, "তাকে দেখতে পাচ্ছি না। সে পালিয়েছে।"

প্রভোস্ট বললেন, "বুড়ীমা, মিছে কথা বলো না। একটা ডাইনীকে তোমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, ধরে রাখবার জন্য। সে কোথায়?"

বৃদ্ধা সোজা উত্তর না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে বলল, "ওঃ সেই মেয়েটির কথা বলছ? সে আমার হাত এমন কামড়ে দিয়েছিল যে, আমি তাকে ধরে রাখতে পারিনি! হল তো! যাও এখন। আমায় আর বিরক্ত করো না।"

"সত্যি কথা বলো। তাকে কোথায় রেখেছ! জানো তুমি কার সাথে কথা বলছ?"

"স্বয়ং ভগবান এলেও আমি এর বেশী কিছু বলতে পারব না।"

"তাহলে সে পালিয়েছে? কোন দিকে গেছে?"

"ওই দিকে।"

প্রভোস্ট একজন সৈন্যকে সেই দিকে পাঠালেন। বৃদ্ধা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এমন সময় একজন সৈন্য প্রভোস্টকে বলল, "ওকে জিজ্ঞাসা করুন তো জানালার গরাদেটা কি করে ভাঙল।"

এই প্রশ্নে বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়ল। কিন্তু তবু স্থিরভাবেই বলল, "ওটা বরাবরই ভাঙা।"

"ধেৎ! মাত্র সেদিন নতুন গরাদে বসান হয়েছে।"

"মাতালের মত বাজে বকো না। বছরখানেক আগে একটা পাথর বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় এটা ভেঙে গেছে। এজন্য আমি খুব বকাবকি করেছিলাম, মনে আছে?"

"বুড়ী সত্যি কথাই বলছে। গরাদেটা যখন ভাঙে, তখন আমি এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম।"—একজন সৈনিকের এই অযাচিত সাক্ষ্যে বৃদ্ধা তার হারানো সাহস ফিরে পেল। তার তখন জীবনমরণ সমস্যা।

প্রথম সৈনিকটি আবার বলল, "গাড়ির ধাক্কায়ই যদি ভাঙবে, তবে গরাদেটা ভিতর দিকে বেঁকে যাবে। কিন্তু এ তো উলটো দেখা যাচ্ছে।"

"আমি সত্যিই বলছি, গাড়ির ধাক্কায়ই এটা ভেঙেছে। তা ছাড়া ঐ সৈন্যটিও তো দেখেছে।"

"কিন্তু গরাদেটা যে সদ্য ভাঙা মনে হচ্ছে।"

বৃদ্ধা হকচকিয়ে গেল। তবুও হাল ছাড়ল না। বলল "সদ্য ভাঙা কি করে হবে। মাসখানেক আগে ভেঙেছে, হয় তো পনরো দিন আগেও হতে পারে।"

"এই যে বললে, বছরখানেক আগে ভেঙেছে?"

"তা হয় তো বলেছি। আমি কি আর সন তারিখ মনে করে বসে আছি? তবে এটা ঠিক, গাড়ির ধাক্কায়ই ভেঙেছে।"

যে সৈন্যটি এস্‌মেরেলদার খোঁজে গিয়েছিল, সে এসে খবর দিল, তাকে ওদিকে পাওয়া গেল না। বুড়ী মিছে কথা বলেছে।

বৃদ্ধা বলল, "আমার হয় তো ভুল হয়েছে। আমি তো আর ঠিক দেখিনি।"

প্রভোস্ট বললেন, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ডাইনীটার বদলে একেই নিয়ে ফাঁসি দি।"

"তাই দাও। আমি এক্ষুনি যেতে রাজী।"

বৃদ্ধা ভাবল, এই ফাঁকে তাহলে তার মেয়ে পালাতে পারবে।

"বুড়ীটার সত্যি মাথা খারাপ। নইলে সাধ করে কে ফাঁসি যেতে চায়!"

একজন সৈন্য বলল, "বুড়ী যদি ডাইনীটাকে ছেড়েই দিয়ে থাকে, তবে ইচ্ছে করে দেয়নি। ও ছিল তার দু চোখের বিষ। দিন রাত তাকে শাপমন্যি করত।"

প্রভোস্ট তখন সৈন্যদের অন্য দিকে খোঁজ করবার আদেশ দিলেন। তার পর সে স্থান ত্যাগ করে গেলেন।

বৃদ্ধার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বাঁচা গেল।"

সে তার মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করতে বসল। নিয়তি অলক্ষ্যে হাসল।

॥ ৩৯ ॥

সৈন্যদল চলে গেছে ভেবে মা মেয়ে দুজনেই যখন নিশ্চিন্ত, তখন একজন অশ্বারোহী প্রভোস্টকে বলছিল, "আমি সৈনিক। বিদ্রোহ দমন করা আমার কাজ। সে আমি করেছি। কিন্তু ডাইনী খুঁজে বেড়ান আমার কাজ নয়। আমি চললাম।" এই অশ্বারোহী ক্যাপটেন ফিবাস্।

এস্‌মেরেলদা এ স্বর শুনে চমকে উঠল। এ যে তার ফিবাসের গলা!

তার মা তাকে বাধা দেবার আগেই সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল স্বরে ডাকতে শুরু করল, "ফিবাস্, আমার ফিবাস্। একবার আমার কাছে এসো।"

ফিবাস্ আগেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভোস্ট তখনও সেখানে ছিলেন।

বৃদ্ধা বাঘিনীর মত মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। প্রভোস্ট তাকে দেখে ফেলেছেন।

তিনি হেসে হেসে বললেন, "এক ফাঁদে দুই ইঁদুর। আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল।" তিনি আদেশ দিলেন, "ডাইনীটাকে ধরে আন।"

"কোন্‌টাকে আনব?"

"মেয়েটাকে।"

সৈনিকটি এগিয়ে আসতেই বৃদ্ধা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও?"

"তোমাকে নয়।"

"তবে কাকে?"

"মেয়েটিকে।"

"এখানে আর কেউ নেই। কেউ নেই কেউ নেই।"

"আছে। আর তা তুমি ভাল করেই জান।"

"আমি বলছি কেউ নেই।"

"আমরা তাকে দেখেছি। সে ভেতরেই আছে।"

"এসো, খুঁজে দেখো। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখো।"

বৃদ্ধার লম্বা লম্বা নখ ও চোখের দৃষ্টি দেখে সৈনিকটি ভিতরে মাথা গলাতে সাহস পেল না।

তখন প্রভোস্ট নিজেই এগিয়ে এলেন। কঠোর স্বরে আদেশ করলেন, "মেয়েটিকে বিনা বাধায় আমাদের হাতে দিয়ে দাও। রাজার আদেশ অমান্য করো না। আর তা ছাড়া তাকে লুকিয়ে রেখে তোমার কি লাভ হবে?"

"আমার কি লাভ হবে? এ যে আমার মেয়ে।"

"কিন্তু রাজার আদেশ।"

"তোমাদের রাজা হতে পারে। আমার কে? এ আমার মেয়ে। আমি তার মা।"

প্রভোস্ট তখন দেওয়াল ভাঙ্গতে আদেশ দিলেন। তাও বড় সহজ হল না। সৈন্যেরা যখন দেওয়ালের পাথর খসাচ্ছিল, সেই পাথরই সে তাদের মাথায় ছুড়ে মারতে লাগল।

দেওয়ালে বেশ চওড়া ফুটা করা হয়েছে। বৃদ্ধা তখন সেই ফুটা জায়গায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সৈন্যেরা আগাতে পারল না।

প্রভোস্ট বললেন "একটা স্ত্রীলোককে তোমাদের এত ভয়?"

"এ তো স্ত্রীলোক নয়, এ যে বাঘিনী।"

তখন আরও পাথর সরান হল। বৃদ্ধা দেখল, আর আশা নেই। সে তখন এস্‌মেরেলদাকে তুই হাতে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বিশ বছর আমার মেয়ে আমার কোল ছাড়া। আজ আমি তাকে কোলে ফিরে পেয়েছি, আর আজই তোমরা তাকে কেড়ে নেবে? তোমরা কি এতই নিষ্ঠুর! তোমাদের কি মা নেই? তোমাদের কি মেয়ে নেই?"

বৃদ্ধার এই অনুনয়ে সৈন্যদের চোখ জলে ভরে এল। প্রভোস্টের চোখও শুকনা রইল না। কিন্তু উপায় নেই। রাজার আদেশ পালন করতেই হবে।

সৈন্যরা ভিতরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধা আর তাদের বাধা দিল না। শুধু তার মেয়েকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইল। সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই মেয়েকে মার কাছ থেকে আলাদা করতে পারল না।

এস্‌মেরেলদা মায়ের বুকে থেকেও কাঁপতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "মা, তুমি আমায় ছেড়ে দিও না। তাহলে ওরা আমায় ধরে নেবে।"

"না মা, আমি তোমায় ছাড়ব না। আমার বুকে তোমায় বেঁধে রাখব। দেখব, আমার বুক থেকে তারা তোমায় কেমন করে কেড়ে নেয়।"

কিছুতেই যখন দুজনকে আলাদা করা গেল না, তখন প্রভোস্টের আদেশে সৈন্যরা দুজনকেই বধ্যভূমির দিকে নিয়ে গেল।

জল্লাদ এত ফাঁসি দিয়েছে। কিন্তু জীবনে এমন বিপদে পড়েনি। সে কোন রকমে এস্‌মেরেলদার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিল। কিন্তু মার বুকের বাঁধন থেকে তাকে মুক্ত করতে পারল না। সে কি করবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় মা তার হাতের বাঁধন আলগা করে মেয়ের মুখ চুমায় চুমায় ভরে দিচ্ছিল, এই সুযোগে জল্লাদ এস্‌মেরেলদাকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। বৃদ্ধা তখন ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত জল্লাদের হাত কামড়ে ধরল। সৈন্যরা ছুটে এসে তাকে জোরে ধাক্কা মারতেই সে ছিটকে গিয়ে পাথরের উপর পড়ল। তাকে তুলতে গিয়ে দেখে তার মাথা ফেটে গেছে। দেহেও প্রাণ নেই।

বাধা দেবার আর কেউ রইল না। জল্লাদ তখন রাজার আদেশ পালন করল। এস্‌মেরেলদার ফাঁসি হয়ে গেল।

॥ ৪০ ॥

কোয়াসিমোদো দেখল ঘর শূন্য, এস্‌মেরেলদা নেই। সে যখন তাকে রক্ষা করবার জন্যই প্রাণপণে লড়ছিল, সেই ফাঁকেই কে তাকে সেখান থেকে নিয়ে গেছে।

রাগে দুঃখে সে তার মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। তারপর জিপসী মেয়েটিকে খুঁজতে শুরু করল। ঠিক সেই সময় বিজয়ী রাজসৈন্যও গির্জায় প্রবেশ করল। কোয়াসিমোদো জানত না, কি উদ্দেশ্যে তারা এস্‌মেরেলদার খোঁজ করছে। সে ধরে নিয়েছিল, তারাও তারই মত শুধু বিদ্রোহীদেরই শত্রু। তাই সেও তাদের এই অনুসন্ধান-কার্যে সাহায্য করতে লাগল।

গির্জার প্রতিটি অংশ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। রাজসৈন্য হতাশ হয়ে গির্জা ছেড়ে শহরে তাকে খুঁজতে গেল।

কোয়াসিমোদো তখনও আশা ছাড়ল না। সে একাই আবার গির্জার প্রতিটি কক্ষ, প্রতিটি গ্যালারি, প্রতিটি কোণ, প্রতিটি অংশ দশবার বিশবার একশো বার করে খুঁজতে লাগল। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হল। কোয়াসিমোদোর আর সন্দেহ রইল না, এস্‌মেরেলদাকে কেউ চুরি করে নিয়েছে। তাকে আর পাওয়া যাবে না। তখন সে হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল।

কতক্ষণ সে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ক্লান্ত পদে সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ আগেও যেখানে এত হাঙ্গামা হয়েছে, সেই গির্জা এখন নির্জন, নিঃশব্দ।

উপরে উঠবার সময় সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগল, এস্‌মেরেলদা হয় তো তার বিছানায়ই আছে, ঘুমাচ্ছে কিংবা উপাসনা করছে। পাছে পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়, তাই পা টিপে টিপে সে তার ঘরের কাছে এল। কিন্তু বিফল আশা! এস্‌মেরেলদা নেই!

কোয়াসিমোদো তখন হাতের আলো নিভিয়ে দিয়ে দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে লাগল। শেষে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে এলে সে এস্‌মেরেলদার শয্যায় লুটিয়ে পড়ল। তার মনে হল, তার দেহের উত্তাপ যেন তখনও শয্যায় লেগে আছে! একটু বাদেই আবার সে দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে শুরু করল। সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, খুলি ফেটে রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না। এ ভাবে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে আবার সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে এলে তার মনে হল, এ আর্কডিকন ছাড়া আর কারো কাজ নয়। তিনিই এস্‌মেরেলদাকে চুরি করেছেন। কারণ একমাত্র তাঁর কাছেই চাবি ছিল। আর কেউ এ কাজ করলে কোয়াসিমোদো হয় তো তার মাথা ফাটিয়ে দিত। কিন্তু ক্লঁদ ফ্রোলো তার পালক, শিক্ষক। তাই শুধু ক্ষোভে, দুঃখে তার বুক ফাটাতে লাগল।

তখন রাত শেষ হয়েছে। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কোয়াসিমোদো দেখল, ক্লঁদ ফ্রোলো টাওয়ারে পায়চারি করছেন। তাঁর দৃষ্টি শূন্য। তিনি যেন এ জগতে নেই। কোয়াসিমোদো যে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তা তিনি টেরও পেলেন না। তার একবার ইচ্ছে হল সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তিনি সেখানে কি করছেন, এস্‌মেরেলদার কথা জানেন কিনা।

কিন্তু ক্লঁদ ফ্রোলো তখন সেখান থেকে আর এক দিকে চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে দেখল, তিনি দেওয়ালে ভর দিয়ে সীন্ নদীর ওপারে এক দৃষ্টিতে কি দেখছেন। কোয়াসিমোদোও তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সে দেখল, তাঁর দৃষ্টি বধ্যভূমির দিকে। সেখানে বহু সৈন্য ও লোকজনের ভিড়।

একজন লোক সাদা কি একটা ফাঁসিকাঠের দিকে নিয়ে চলেছে, তার গায়ে কালো কি একটা জড়ানো। তারপর কি হল, সে অত দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারল না।

তখন রোদ উঠেছে। সেই আলোয় সে এবার স্পষ্ট দেখল, জল্লাদ

একটা মেয়েকে ফাঁসি দিতে নিয়ে চলেছে। তার পরনে সাদা পোশাক। সে মেয়ে আর কেউ নয়, তার এস্মেরেলদা।

কোয়াসিমোদো রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকিয়ে রইল। এক সময়ে দেখল অভাগিনীর মৃতদেহ ফাঁসিকাঠে ঝুলছে। ঠিক সেই সময় ক্ল্যঁদ ফ্রোলো অট্টহাসি হেসে উঠলেন। কোয়াসিমোদো সে হাসি শুনতে পেল না, কিন্তু তা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। সে তখন তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল। পড়তে পড়তে ক্ল্যঁদ ফ্রোলো একটা শীসের পাইপে আটকে গেলেন, এবং সেখানেই ঝুলতে লাগলেন, তারপর নীচে পড়ে গেলেন। তাঁর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তাঁর রক্তে পথ ভেসে গেল।

সেদিন থেকে কোয়াসিমোদোরও আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ফাঁসির পর মৃতদেহগুলি মণ্ট্ফকন্ গুহায় ফেলে দেওয়া হত। বছর দেড়েক পরে সরকারী লোকজন কি কাজে সে গুহা খুঁড়তে গিয়ে দুটি অদ্ভুত কঙ্কাল আবিষ্কার করল। একটি কঙ্কাল নারীর। তার সাদা পোষাকের টুকরা তখনও গায়ে লেগে আছে। গলায় একটা মালা। তার সাথে একটা সিল্কের থলি, তার মাঝখানে সবুজ পুঁতি বসান।

অন্য কঙ্কালটি পুরুষের। তার পিঠটি কুঁজো, একটি পা ছোট। তার গলায় ফাঁসির কোন দাগ নেই। মনে হয় সে নিজের ইচ্ছায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। তার হাত দুটি দিয়ে নারীদেহটিকে জড়িয়ে ধরা ছিল।

সরকারী লোকেরা এ কঙ্কালটিকে আলাদা করবার চেষ্টা করতেই তা গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেল।

কারো কারো ধারণা, এই কঙ্কালটি কোয়াসিমোদোর।

সমাপ্ত